প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৬

প্রকাশিকা : বুলবুল মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অলোকশঙ্কর মৈত্র

মুদ্রাকর : ভগুশ্রী প্রিন্টার্স : কলিকাতা-৬

কল্যাণীয়াসু

জয়ন্তী মিত্রকে—

বাড়ির সামনে পৌঁছে বাইকটা দাঁড় করালো বব। বব এনড্রুস। ছিপছিপে রোগাটে গড়ন। বাইকটা দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লো সে। পকেট থেকে চাবির রিংটা বার করে বাইক লক করলো প্রথমে। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল নিজের বাড়ির দরজাটার দিকে। ববের বাড়িটা পাহাড়ের একটা উঁচু টিলার ওপর। সামনে পাহাড়, পিছনে বিস্তৃত সমতল ভূমি।

দরজাটা খুলে বব ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র শুনতে পেল মায়ের কণ্ঠস্বর।

কে, রবার্ট?

হ্যাঁ মামনি, আমি।

সামনের করিডর ধরে উত্তর দিয়ে বব এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

কি ব্যাপার? আজ এত তাড়াতাড়ি। লাইব্রেরীতে যাওনি?

হ্যাঁ। ওখান থেকে আসছি।

উত্তর দিতে দিতে বব এবার এসে দাঁড়ালো রান্নাঘরের দরজার সামনে।

রান্নাঘরের ছোট উঁচু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মহিলা রুটি করছিলেন। বব দরজার সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র, তিনি একবার তাকালেন তার দিকে। তারপর বললেন খুব সহজ গলায়—ও হ্যাঁ তোমার বন্ধু জুপিটার এসেছিল তোমার খোঁজে। একটা ম্যাসেজ রেখে গেছে সে।

জুপিটারের নাম শোনা মাত্র বব সতর্ক হলো যেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—কি বলেছে সে?

মহিলা এবার তাকালেন ববের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমি লিখে রেখেছি। কাগজটা আমার পকেটেই আছে। হাতের কাজটা সেরে নিয়েই আমি ওটা দিচ্ছি তোমাকে।

কথাটা বলে মহিলা আবার তার নিজের কাজে মন দিলেন। মায়ের এই নিরুৎসাহ ভাবটা ভাল লাগল না ববের। সে নিজের মনে ভীষণ উত্তেজনা বোধ করছিল।

বিশেষ করে জুপিটারের চিঠি বলে কথা। বব জানে, আর সব সমবয়সি বন্ধুদের তুলনায় জুপিটার একটু অন্য ধরণের। সকলে যা সহজে চিন্তা করে জুপিটার তা করে না। সাধারণ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার ছেলে সে নয়। তার জগৎ একটু আলাদা, বিচিত্র ধরণের, অন্য সকলের চাইতে তফাৎ অনেক। কাজেই সে যখন এসেছিল, তার ওপর চিরকুট রেখে গেছে, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব জরুরী বুঝতে হবে। তাই সে আবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—কি লিখেছে চিঠিতে, তোমার মনে নেই কিছু?

আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক তেমন জরুরী নয়। খুব সাধারণ একটা চিঠি। তবে তোমার বন্ধুকে তো আমি চিনি। সাধারণ ঘটনাকে সে অসাধারণ ভাবে বোঝাতে খুব ওস্তাদ।

মায়ের কথাটা যেন ববের ঠিক পছন্দ হলো না। সে মায়ের কথায় মৃদু প্রতিবাদ করে বললে—কথাটা ঠিক বললে না মামনি। জুপিটার মোটেই সাধারণ ছেলে নয়—সে সব সময় অসাধারণ। এমন কি তার ভাবনা চিন্তাও। একটু থেমে বব এবার তার মাকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো, তার আংটি হারানোর ঘটনাটা। সত্যি—ভারি রহস্যময় ঘটনা। যদিও এমন কিছু ভয়ানক ঘটনা ওটা নয়, তবু জুপিটার এক মুহূর্তে যা করেছিল তা ভাবলে এখনো তাজ্জব হতে হয়। মহিলার মনে পড়লো গত বছর বসন্তকালের একটা দিনের কথা। একসময় তিনি কাজের মধ্যে লক্ষ্য করলেন তার হাতের হীরের আংটিটা নেই। আংটিটা তার বিয়ের সময়কার—বহুদিনের। বড় একটা খুলে যায় নি কোনদিন। গোটা বাড়ি—বাড়ি সংলগ্ন ছোট্ট খামারের প্রায় সবটুকুই তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন আংটিটাকে। কোথাও পাওয়া যায় নি। অথচ জুপিটার তাদের বাড়ি এসে ববের মুখ থেকে তার মায়ের আংটি হারাবার কথা শুনে, চোখ বুজে এক মুহূর্ত কি যেন ভেবেছিল। তারপর

ববের মায়ের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো বলেছিল—একবার রান্নাঘরের তাকটা খোঁজ করুন তো। মনে হয় ওই তাকের কোণের দিকে আংটিটা আছে।

জুপিটারের কথা প্রথমে বিশ্বাস হয়নি মহিলার। তবু তিনি খোঁজ করেছিলেন একসময় তার কথা মতো। আর এই খোঁজ করতে গিয়েই অবাক হয়েছিলেন তিনি। টমেটোর তৈরি জেলীর জারের পাশে আংটিটাকে সত্যি সত্যি পড়ে থাকতে দেখে।

পুরনো কথাটা মনে করে এবার মহিলা তাই আগের রহস্য উপলব্ধি করেই বললেন—সত্যি, আমি আজো ভেবে পাই না ও এত সঠিক ভাবে বলতে পারলো কি করে আংটিটা কোথায় থাকতে পারে।

মায়ের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের আঁচ অনুভব করে বব এবার বন্ধুর পক্ষ সমর্থনে বললে—তাহলেই বোঝ, সে খুব একটা সাধারণ ছেলে নয়। সে লোকের মন গণনা করতে পারে। জানতে পারে সবকিছু।

তা মানছি।

সেইজন্য ওর চিরকুটটা আমার একবার দেখা দরকার।

ঠিক আছে দেখবে, আর এক মিনিট দাঁড়াও। আমার হাতের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি।

বব অপেক্ষা করতে লাগলো মায়ের দিকে তাকিয়ে। মনের মধ্যে তার তুমুল চিন্তার ঢেউ তখন ওঠানামা করছে জুপিটারকে নিয়ে।

ইতিমধ্যে একটা কথা জানিয়ে রাখি, যা পৃথিবীর তাবৎ মানুষের জানা উচিত, তাহলো জুপিটার একটা রোলস রয়েস গাড়ি পুরস্কার পেয়েছে তিরিশ দিনের জন্য। শহরের বিখ্যাত এক মোটর কোম্পানী প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল—জুপিটার সেই প্রতিযোগিতায় জিতেছে। আর তারি পুরস্কারস্বরূপ সে পেয়েছে একমাসের জন্য একটা শৌখিন সোনার পাত বসানো রোলস রয়েস গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ। ববের মনে হলো ও যখন এই পুরস্কার জিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোন পরিকল্পনা আছে। আর পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সাধারণ নয়। মনে হয় ওই গাড়ি নিয়ে জুপিটার তাকে সঙ্গী করে কোথাও যেতে

চায়। কথাটা মনে হওয়া মাত্র বব নিজের মধ্যে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলো। দু'হাতে রান্নাঘরের দরজার দু'পাশ ধরে শরীরটাকে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বব বললে কিঞ্চিত আদুরে গলায়—মামনি প্লীজ, আমি কিন্তু এখনো চিরকুটটা পেলাম না।

হ্যাঁ বাবা, এই বার পাবে। দিচ্ছি। হয়ে গেছে আমার। কথাটা বলে মহিলা তার আটামাখা হাতটাকে গায়ের লম্বা ধরণের সাদা কোটের ওপর ঝেড়ে নিতে নিতে বললেন—জুপিটার জোন্স তিরিশ দিনের জন্য রোলস রয়েস গাড়ি আর একটা ড্রাইভার নিয়ে কি করবে বলতে পার বব ?

মায়ের কথায় বব হাসলো। বললে মায়ের দিকে তাকিয়ে—আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম মামনি।

ববের কথা শুনে মহিলা বললেন—এই ধরণের পুরস্কারের কোন মূল্যই হয় না। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এই সব প্রতিযোগিতায় যারা পুরস্কার পায়, তারা অধিকাংশই কাজে লাগাতে পারে না। যেমন সেই মেয়েটির কথা, তোমার মনে নেই বব—টেলিভিসন প্রোগ্রাম জিতে মেয়েটি একটা হাউসবোট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। অথচ আশ্চর্য—মেয়েটি থাকতো পাহাড়ের একেবারে উপরে, সে জানতোই না এই হাউসবোটকে সে কি ভাবে কাজে লাগাবে।

তা জানি, তবে ওর ক্ষেত্রে এসব প্রযোজ্য হবে বলে মনে হয় না।

ববের কথা শেষ হতে পারল না। তার আগেই তার মা গায়ের ওই লম্বা ঢোলা কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা চিরকুট বার করে বললেন—এই সেই চিরকুট। দেখ পড়ে—আমি তো কিছুই এর মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। একটু হেসে মহিলা ছোট্ট কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে পড়লেন—'গ্রীন গ্রেট ওয়ান। খবর তৈরি হচ্ছে।' বব'তো অবাক হলো। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—

কিছু বুঝলে ?

না। যতসব পাগলের কাণ্ড। এই নাও তোমার বন্ধুর চিঠি। তোমার পাগল বন্ধুর চিঠি নিয়ে পাগলামো করার মতো সময় আমার হাতে

নেই। আমার হাতে অনেক কাজ আছে এখন। কথাটা বলে তিনি চিরকুটটা এগিয়ে দিলেন ববের হাতে। বব চোখ বোলালো। ভাবতে চেষ্টা করলো জুপিটারের লেখা চিঠির ভাষা।

মা আগের মতো নিজের কাজে মনোনিবেশ করার আগে ববের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হলো, কিছু ভেবে পেলে।

বব উত্তর দিলো না কোন। তাকালো কেবল মায়ের দিকে। মহিলা এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার মনে হয়, এই চিঠির ভাষা পৃথিবীর কোন সুস্থ লোকের পক্ষে চিন্তা করে অর্থ বার করা সম্ভব নয়। কেউ কিছুই বুঝবে না। তবে যতদূর মনে হচ্ছে আমার, জুপিটার কোন রহস্যজনক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেছে এখানে।

বব মায়ের শব্দটাকে যেন লুফে নিল। তারপর দ্রুত চিরকুটটা পকেটে ফেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—

আমি চললাম।

চললি কিরে, কিছু খাবি না?

না সময় নেই। এক্ষুনি আমায় জুপিটারের বাড়িতে একবার যেতে হবে।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস?

চেষ্টা করবো।

কথাটা বলে বব আর একমুহূর্ত দাঁড়ালো না। সোজা করিডর পার হয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল।

বাইক ছুটে চললো ববের। পাহাড়ি রাস্তা। উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁসে রাস্তাটা একটু একটু সমতল হয়েছে। একদিকে বড় বড় পাহাড়ের সুদৃশ্য নীলাভরণ দৃশ্য আর অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের দুরন্ত সফেন জলরাশি। সব মিলিয়ে পাহাড়ি রাস্তাটা দুর্গম হলেও, সুদৃশ্য বটে।

ববের বাইক ছুটছিল।

তার লক্ষ্য জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ডের দিকে। এখনো বেশ খানিকটা রাস্তা যেতে হবে ববকে। জোন্স ইয়ার্ড বেশ খানিকটা বড় জায়গা নিয়ে বেড়া

দিয়ে ঘেরা। এখানে যত রাজ্যের পুরনো ভাঙ্গাচোরা জিনিস গুদাম করা হয়। এই সংরক্ষণশালার আসল মালিক হলেন জুপিটার জোন্সের কাকা টিটাস জোন্স। ভদ্রলোক জায়গাটাকে ভারি সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। চারিদিক রঙিন ছবিতে ঘেরা। দূর থেকে ইয়ার্ডটাকে দেখলে মনে হয় যেন রঙ তুলিতে আঁকা একটা সুন্দর জায়গা, ঠিক রঙিন জলছবির মতো সাজানো গোছানো। বড় বড় মস্ত বোর্ডের ওপর রঙতুলি দিয়ে আঁকা পাকা হাতের সব ছবি। গাছপালা, ফুলফল, আরো কত রকমারি দৃশ্য, যা দেখলে চট করে তুলির আঁকা বলে মনে হয় না। মনে হয় সব কিছু যেন জীবন্ত, সতেজ। রঙিন ছবিতে ঘেরা জায়গাটা তাই বাচ্চাদের কাছে খুব প্রিয়। স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে ভদ্রলোক এইসব কাজগুলো করিয়েছেন। সেই কারণে এখানকার লোকদের কাছে জায়গাটা জঞ্জালের রঙিন সংরক্ষণশালা নামে পরিচিত।

পাহাড়ি রাস্তার সংকীর্ণ পথ ধরে বাইক ছোটাতে পায়ে বেশ লাগছিল ববের। কয়েকদিন আগে সে পাহাড়ি রাস্তায় সাইকেল চালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। পায়ে লেগেছিল বেশ। ডাক্তার এ্যালভার্জ বলেছিলেন, একটু সাবধানে থাকতে। বাইক থামিয়ে বব নেমে পড়লো। পায়ের জুতোটা খুলে আবার নতুন করে ব্যাণ্ডেজ করে বাইকে উঠলো বব। খুব একটা দূর নেই আর। কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। সামনেই জোন্স ইয়ার্ডের বড় লোহার গেটটা দেখা যাচ্ছে। বব এগিয়ে যায়। সামনের দিকটা ভারি সুন্দর সাজানো। বড় বড় গাছ, সতেজ। ফুলে ফলে ঢেকে আছে চারিদিক—সবই তুলি-রঙে আঁকা।

সামনের গেটটা পার হয়ে যায় বব। আরো একশো গজ তাকে এগুতে হবে। এবার একটা ছোট গেট। বব পার হয়ে যায়। এবার ওর লক্ষ্য পড়ে কোণের দিকে। সমুদ্রের বুকে দুটো পাল তোলা জাহাজ যেন ঝড়ের মধ্যে পড়েছে। এখনো ডুবে যায় নি। ডুবু ডুবু অবস্থা। বব এই আঁকা দৃশ্যের মধ্যে দেখতে পায় কাঠের তৈরি ছোট্ট একটা দরজা। দরজাটা জুপিটার নিজে করেছে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। এই গেটকেই বব জানে, বলা হয়, গ্রীন গেট ওয়ান।

বব তার বাইক থেকে নেমে পড়লো। তার বাইকটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে সে এগিয়ে গেল গ্রীন গেট ওয়ানের সামনে। দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলো কিছু যেন : জলের ভিতর একটা মাছ ভাসছে। বব মাছটাকে দেখতে দেখতে তার তর্জনীটা এবার ছোঁয়াল মাছের চোখের ওপর। আশ্চর্য দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে! ভিতরে ঢুকলো বব।

সামনে এক ফালি জায়গা। জায়গার একমাত্র মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন আছে। ছ'ফিট উঁচুতে এই আচ্ছাদন। পুরনো মালপত্র রাখার গুদাম ঘরের এক পাশে এই জায়গাটা। এখানে জুপিটারের কাজের কিছু সরঞ্জাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই অংশটা যে জুপিটারের মূল্যবান কাজের ওয়ার্কসপ তা ববের জানা আছে। বব এবার কিছুটা এগিয়ে গেল। সামনেই ছোট একটা দরজা। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এবার অবাক হলো সে।

প্রথমেই চোখে পড়লো তার জুপিটার জোন্সকে। পুরানো আমলের একটা উঁচু ধরনের মেহগিনি কাঠের তৈরি চেয়ারে খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে জুপিটার। মনে হয় কোন একটা ব্যাপার নিয়ে সে চিন্তামগ্ন। দাঁত দিয়ে ক্রমান্বয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে চলেছে এক ভাবে। জুপিটার চিন্তা করার সময় এইভাবে দাঁত দিয়ে সে তার ঠোঁট কামড়ায় তা ববের জানা। জুপিটারের আত্মস্থ দৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বব এবার তাকালো। দেখতে পেলো ঘরের একদিকে ছোট্ট একটা ছাপা মেশিন এক মনে চালাচ্ছে পীট। তার লক্ষ্য নেই আর কোনদিকে। মেশিনটা একটানা শব্দ করে চলেছে। পীট একটা করে ছোট সাদা কার্ড হাতে তুলে নিয়ে মেশিনের ভিতরে দিচ্ছে—আবার তা তুলে নিচ্ছে। মনে হয় কিছু একটা ছাপাচ্ছে সে। জুপিটারের লক্ষ্য সেই দিকে। বব এবার একটু উৎসাহ বোধ করলো। ব্যাপারটা তার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছিল। বার বার দেখার চেষ্টা করছিল পীট কি এমন গোপনীয় জিনিস ছাপিয়ে চলেছে।

তিনটি তরুণ এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে—সেখান থেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না বা কেউ যে তাদের লক্ষ্য করছে না এটা পরিষ্কার বোঝা

যায়। পাশের ঘরে জোন্সের কাকীমা ম্যাথিডা মনে হয় কথা বলছেন কারো সঙ্গে। মহিলা ব্যবসা সম্বন্ধে বেশ সতর্ক! মনে হয় ব্যবসা সংক্রান্ত গোপনীয় কিছু কথা তিনি বলছেন কাউকে। ববের আগমন সেই কারণে তিনি টের পান নি।

বব এবার এগিয়ে গেল ঘরের মধ্যে আরো কিছুটা। এতক্ষণে জুপিটার জোন্স যেন তাকে লক্ষ্য করলো। বললে—তুমি কিন্তু দেরী করে ফেলেছ বব।

জুপিটারের কথাটা কানে যেতেই পীট তাকালো ববের দিকে। তারপর একটা ছাপা কার্ড ববের হাতে দিয়ে বললে—দেখ একবার!

কার্ডটা কৌতূহল হাতে নিলো বব। অবাক হলো বেশ। কার্ডটা একটু বড় আকারের। আরো অদ্ভুত লাগলো ববের ছাপানো বিষয়টার ওপর চোখ বুলিয়ে। বড় কার্ডের একপাশে বড় বড় হরফে লেখা আছে—তিনজন সন্ধানকারী! তারপর একটু তলায় আর একটু ছোট হরফে লেখা—আমরা যে কোন ধরনের তদন্ত করতে প্রস্তুত। তারপর কিছু নিচে পাশাপাশি তিন-তিনটে প্রশ্ন চিহ্ন! আর এই প্রশ্ন চিহ্নের নিচে সারিবদ্ধ তিন টে নাম।

প্রথম তদন্তকারী—জুপিটার জোন্স।

দ্বিতীয় তদন্তকারী—পিটার ক্রেনশ।

তৃতীয়—অর্থাৎ তিন নম্বরে লেখা রেকর্ড ও রিসার্চের পাশে, বব এনড্রুসের নাম।

বব কার্ডটার ওপর চোখ বোলালো বার কয়েক। তারপর বিস্ফারিত চোখে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললে—কি ব্যাপার জুপ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বড় অবাক লাগছে।

খুব স্বাভাবিক। বিজ্ঞের মতো কথাটা ছুঁড়ে দিল জুপিটার ববের উদ্দেশ্যে। তারপর কণ্ঠস্বর নরম করে বললে—বহুদিন আগে থেকে তোমাকে তো বলেছিলাম, আমার একটা 'ইনভেসটিগেশন এজেন্সি' খোলার ইচ্ছে আছে মনে নেই তোমার?

তা আছে।

এটা হলো তারি একটা পদক্ষেপ। একটু থেমে জুপিটার আবার বললে—তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি তিরিশ দিনের জন্য একটা "রোলস রয়েস" পুরস্কার পেয়েছি। তিরিশ দিন হিসাবে প্রতি দিনের চব্বিশ ঘন্টা এই গাড়িটা আমার দখলে থাকবে। কাজেই গাড়িটাকে আমি যে রকম খুশী ব্যবহার করতে পারবো। সেই জন্য ঠিক করেছি বহুদিনের সেই ইচ্ছেকে কাজে লাগাবো এবার। আর আমরা তিনজনই থাকবো এই প্রতিষ্ঠানের তদন্তকারী।

বব অবাক হয়ে শুনছিল জুপিটারের কথাগুলো। মনে মনে যে উৎসাহবোধ করছিল না তা নয়। সেও ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা চিন্তা করে মজা পাচ্ছিল। তবু মুখে সে কিছু বললো না। কেবল চুপচাপ শুনে যেতে লাগলো জুপিটার জোন্সের কথাগুলো।

জুপিটার বলছিল—প্রথম তদন্তকারী হিসাবে আমার দায়িত্ব হলো পরিকল্পনা তৈরি করা।

দ্বিতীয় তদন্তকারী পিটারের কাজ হলো আমার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা। অর্থাৎ তদন্তের মূল কাজ আমি তাকে নিয়েই করবো। অবশ্য ওকে এই কাজ দেবার পিছনে আমার একটা বিশেষ কারণও আছে; তাহলো পিটারের শারীরিক গঠন, তোমার চাইতে অনেক বেশী মজবুত। সে একজন ভালো এ্যাথলেট—কাজেই তার পক্ষে অবস্থা বুঝে ঝুঁকি নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করে যে কাজ করা সম্ভব, তা তুমি করতে পারবে না। তাই তোমার কথা চিন্তা করে আমি তোমাকে তোমার মনের মতো কাজ দিয়েছি। তোমার কাজ হলো আমাদের কাজের সমস্ত রেকর্ডগুলোকে গুছিয়ে রাখা। এবং আমাদের কাজের প্রতিদিনের রিপোর্টগুলোকে দেখে, পর্যালোচনা করা, যা আমাকে পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

কথাটা বলে জুপিটার একটু থামলো। তারপর বললে; আমার মনে হয় তোমার এই ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। বব উৎসাহ মাখা গলায় বললে—মোটেই না। বরং এই কাজে আমি যে তোমাদের

তুলনায় চোস্ত তা আমি বলতে পারি। লাইব্রেরীতে কাজ করার ফলে এই কাজ করা আমার পক্ষে সহজ হবে।

দ্যাটস রাইট। আর সেই জন্যই তোমাকে জরুরী তলব করেছি। জানতো, আধুনিক তদন্তে আত্মবিশ্লেষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

বব হাসলো। উত্তর বুঝিয়ে দিলো সে ওই হাসির মাধ্যমে। জুপিটার এবার তার দিকে তাকিয়ে বললে, আমাদের বিজনেস কার্ড তো দেখলে, কিছু বলার আছে তোমার?

না তেমন কিছু নেই —কেবল ওই তিনটে প্রশ্ন চিহ্নের অর্থ ঠিক বুঝলাম না।

জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে বললে, ঠিক এই প্রশ্নই যে তুমি আমাকে করবে জানতাম। একটু থেমে বললে জুপিটার, ববের দিকে আগের মতো তাকিয়ে, ওই প্রশ্ন চিহ্নই হলো আমাদের সাংকেতিক চিহ্ন। তুমি নিশ্চয়ই জানো প্রতিটি গোয়েন্দার একটা নিজস্ব সাংকেতিক চিহ্ন থাকে, আমাদের কাছে ওটা হলো তাই। তিনটি প্রশ্ন চিহ্ন মানে আমরা তিনজন। তাছাড়া আর একটা কথাও আছে, তাহলো আমাদের এই সাংকেতিক চিহ্ন তোমার মতো আর দশজনের কাছেও রহস্যময় বলে মনে হবে। লোকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাববে, পরস্পরকে প্রশ্ন করবে, যা আমাদের বিজ্ঞাপনের কাজে সহায়তা করবে অনেকখানি।

বব বোকার মতো তাকিয়ে ছিল। উত্তর দিলো না কোন। কি উত্তর সে দেবে। কি-ই বা তার উত্তর দেবার মতো আছে। কোন উত্তর আছে বলে তো তার মনে হলো না।

জুপিটার তাকে নীরব দেখে আবার বললে—প্রত্যেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন চায়—বিজ্ঞাপনই হলো আধুনিক ব্যবসার মূল চাবিকাঠি। মনে হয়, এই ব্যাপারে আমরা অনেক বেশী লাভবান হবো, কি তাই না। এ তোমার কি মনে হয়?

ঠিক তাই।

এতক্ষণে কথা বললে পিটার। ববের দিকে তাকিয়ে সে বললে—

আমাদের এখন কেস পেতে হবে বব।

ঠিক তা নয়।

পিটার ও বব দুজনেই এবার তাকালো জুপিটারের দিকে। জুপিটারের বয়স অল্প হলেও, তার মধ্যে একটা বয়স্ক লোকের ছাপ আছে। ইচ্ছে করলে সে নিজের কণ্ঠস্বরকেও বদলে নিতে পারে অভিজ্ঞ লোকের মতো। করলোও তাই। কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে মুখ চোখের চেহারা কিছুটা স্ফীত করে জুপিটার বললে—দুঃখের বিষয় আমাদের সামনে এখন কিছু বাধা আছে। একটু হেসে জুপিটার বললে আবার—আমাদের সেই বাধার কথা মনে রেখেই প্রথমে খুব ছোট ছোট কেস আমাদের হাতে নিতে হবে, যাতে আমরা অতি সহজে সফল হতে পারি। বড় কেস হাতে নিয়ে কাজ না করতে পারার মধ্যে দুর্নামই বাড়ছে।

জুপিটার চুপ করা মাত্র, বব বললে—তুমি ঠিক কি ধরণের কাজের কথা বলছ জুপ?

কি ধরণের—একটু ভেবে নিয়ে জুপিটার এবার বললে; যেমন ধর আমার কাছে এই মুহূর্তে একটা খবর আছে, মিষ্টার আলফ্রেড হিচকক নাকি তার পরবর্তী ছবির জন্য একটা ভুতুড়ে বাড়ির সন্ধান করছেন। আমরা তাকে এই বাড়ির সন্ধান খোঁজ খবর করে এনে দিতে পারি।

জুপিটারের কথা মনে হয় পীটের খুব একটা পছন্দ হলো না। সে সপাটে দ্রুত উত্তর দিলো—দূর, এটা একটা স্রেফ বাজে কাজ। মিষ্টার হিচককের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তিনি তার ছবির জন্য ভুতুড়ে বাড়ির খোঁজ করবেন। এরজন্য তার নিজের স্টুডিওই যথেষ্ট।

বলাবাহুল্য—চলচ্চিত্রের ব্যাপারে পিটার নিজেকে অন্যের চাইতে বেশী বিজ্ঞ বলেই মনে করে। কারণ সে নিজে একটা হলিউড স্টুডিওতে কাজ করেছে কিছুদিন।

বব কিন্তু পীটের কথায় খুব একটা ভেঙ্গে পড়লো না। বরং বললে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে—ভুতুড়ে বাড়ি, তো তুমি এই ব্যাপারটা কি ভাবে সলভ করতে চাও, জুপ।

আমরা তদন্ত করবো। খুঁজে বেড়াবো। আর খুঁজে পেয়ে তা জানাবো মিষ্টার হিচককে।

তাতে লাভ কি হবে!

লাভ এই যে তিনি আমাদের এজেন্সির নাম কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উল্লেখ করবেন, যা আমাদের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে খুবই দরকার। আর বুঝতেই পাচ্ছ রাতারাতি আমরা ত্রয়ী গোয়েন্দা কতটা জনপ্রিয় হয়ে যাব এই কাজের জন্য।

জুপিটারের কথাই উৎসাহ আসলো ববের মধ্যে। তাই বব এবার জুপিটারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, কথাটা তুমি মন্দ বলো নি তবে আমার মনে হয় এই ব্যাপারে একবার তার অনুমতি নিয়ে নেওয়াটা ভাল। যদি তিনি বলেন, তাহলেই আমরা এই কাজে হাত দিতে পারি। তাছাড়া তুমি নিজেই বলেছ এই কাজের পিছনে ছোট্ট বাধাও আছে!

ঠিকই। সেইজন্য আমি এই কাজের দায়িত্ব হাতে নিতে চাই এই কাজের সাফল্য আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপকে অনেকখানি এগিয়ে দেবে। একটু থেমে জুপিটার বললে, একটা কথা তোমাদের বলে রাখি কাজে সফল না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন ঘুনাক্ষরে আমাদের কাজের ভাবনা চিন্তার কথা জানতে না পারে।

তা নয় হয় বুঝলাম কিন্তু—

ইতিমধ্যেই মিষ্টার আলফ্রেড হিচককে আমি টেলিফোন করেছি।

করেছ, কি বলেছেন তিনি, রাজি হয়েছেন? উৎসাহ মাখা গলায় পীট প্রশ্ন করলো জুপিটারকে। ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় জুপিটার বললে, না, তার সঙ্গে দেখা করার কোন অনুমতি পাই নি। তার সেক্রেটারী আমার সঙ্গে কথা বলতেই রাজি হলো না। ফোন করা মাত্র নামিয়ে রাখলো।

তাহলে!

পীট তাকালো।

জুপিটার বললে—তার সেক্রেটারী হুমকি দিয়ে এও বলেছে, যদি আমরা তার কাছাকাছি যাই, তাহলে সে আমাদের অ্যারেষ্ট করিয়ে দেবে। একটু থেমে জুপিটার তার দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললে—তার এই সেক্রেটারী মেয়েটিকে নিশ্চয়ই তোমরা চেনো, নায় কি দেখেছো।

দেখেছি ?

হ্যাঁ। এই পাহাড়ি রাস্তা দিয়েই সে তার স্কুলে যাওয়া আসা করত—হেনরিটা ল্যারসন—নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ছে এবার ?

জুপিটারের মুখ থেকে নামটা শোনামাত্র পিটার যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুসি বাগিয়ে বললে—ওই খেঁদি বোঁচা মেয়েটা—দাঁড়াও একবার পাই ওটাকে। একটু থেমে পিটার জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললে—ওকে একবার তুমি খুব মেরেছিলে না ?

হ্যাঁ। মেয়েটা ভারি বদ। রোজ ছেলেদের নামে মিথ্যে করে গিয়ে মাষ্টার মশাইর কাছে নালিশ করতো। সে অনেকদিন আগের কথা, তোমার মনে আছে দেখছি। একটু থেমে জুপিটার বললে—যদি সত্যি সত্যি ওই হেনরিটা এখন মিষ্টার হিচককের সেক্রেটারী হয় তাহলে তাকে এখন আমাদের ক্ষমা করতেই হবে। ভুলে যেতে হবে অতীতের ঘটনাগুলো। হাজার হোক আমরা তিনটে জ্যান্ত বাব যখন তাকে গিলতে পারিনি কোনদিন।

বব সমর্থন করলো কথাটা। বললে—সত্যি ঠিক বলেছ, আমরা তিনজনে কি নাজেহালই না হয়েছি ওর কাছে।

থাক ও কথা। শোন এখন যা বলি।

বব এবং পিটার এবার এগিয়ে এলো জুপিটারের দিকে।

জুপিটার পরম বিজ্ঞের মতো নিজের চেয়ার থেকে শরীরটা সামান্য সামনের দিকে সরিয়ে এনে বললে—আগামীকাল সকালে আমরা হলিউডে যাত্রা করবো, মিষ্টার হিচককের সঙ্গে দেখা করতে। টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা না বলে বাড়িতে যাওয়াটাই ভালো, আর যখন একটা সুন্দর গাড়িও পাওয়া গেছে।

তা ঠিক, তবে ভাবছি যদি আমাদের দেখে হেনরিটা সত্যি সত্যি পুলিশে খবর দেয়। কথাটা বলে বব হাসলো। তারপর পিটারের দিকে তাকিয়ে বললে—অবশ্য আমার কোন ভাবনা নেই, আমি তো ওই সময় লাইব্রেরীতে কাজ করবো।

ঠিক আছে, তুমি যেতে না চাও তো আমি আর পীট যাব, কি রাজি তো পীট ?

কেন রাজি হবো না। ও মেয়ে কি করে দেখি না—আমরা তো আর চুরি-ডাকাতি করতে যাচ্ছি না যে ভয় পাবো।

জুপিটার খুশী হলো যেন পীটের কথা শুনে। বললে, তাহলে সেই মতো তৈরি হয়ে এসো। আমি বরং ইতিমধ্যে অটো রেনটাল-এজেন্সিকে টেলিফোনে গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বলবো। কাল থেকেই তো গাড়িটা একমাসের জন্য আমার পাওয়ার কথা আছে।

দারুন।

পীট উৎসাহ বোধ করলো।

জুপিটার বললে, আমরা কাল দশটায় এখান থেকে বেরুবো। গাড়িটা সেইমতো পাঠাতে বলছি তাহলে পীট।

নিশ্চয়ই।

এবার ববের দিকে তাকালো জুপিটার।

কিছু বলবে ?

হাঁ। শোন তোমার একটা কাজ আছে। সকালে লাইব্রেরীতে পৌঁছে তোমার প্রথম কাজ হলো পুরনো কাগজপত্র, আর ম্যাগাজিনের পাতা ঘেঁটে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য সংবাদ জোগাড় করা।

কথাটা বলেই জুপিটার একটা ছাপানো কার্ডের ওপর কলম দিয়ে খস খস করে কি যেন লিখলো, তারপর এগিয়ে দিলো কার্ডটা ববের দিকে। বললে, নাও ধর। কার্ডের ওপর খবর জোগাড়ের বিষয়টা লিখে দিলাম, যাতে তোমার ভুল না হয়। আর মনে হয়, তোমার পক্ষে ক্যাটালগ দেখে ব্যাপারটা খোঁজ করাও সহজ হবে।

বব এবার তাকালো কার্ডটার দিকে। ছাপা কার্ডের অন্যদিকে জুপিটারের হস্তাক্ষর। তাতে লেখা—ভয়ঙ্কর দুর্গ। বব কার্ডটা পকেটে রাখতে রাখতে বললে, ভালই করেছ লিখে দিয়ে।

জুপিটার এবার সতেজ গলায় ববকে সতর্ক করে দিয়ে বললে, আমাদের তিনজন তদন্তকারী, যে যার কাজ বুঝে নিয়েছি। এবার বলি,

আমরা সব সময় কার্ডটা আমাদের কাছে রাখবো। এখন থেকে ওই কার্ডটাই হবে আমাদের পরিচয় পত্র। আর ওটা কাছে থাকলে, আমরাও সবসময় আমাদের কাজ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে পারবো। আর একটা কথা, একটু বসে জুপিটার নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে, এখন থেকে আমরা আমাদের নামের বদলে ওই সাংকেতিক চিহ্নটাই ব্যবহার করবো। মনে থাকবে?

ধন্যবাদ।

কাল সকাল থেকেই তাহলে আমাদের কাজ শুরু হচ্ছে।

হ্যাঁ।

তাহলে এখন আমরা সভা ভাঙতে পারি। আবার কাল সকালে দেখা হচ্ছে—ঠিক দশটায়

সকাল দশটায় জোন্স স্যালভেজ ইয়াডের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো ভারি সুন্দর দেখতে একটা রোলস রয়েস গাড়ি।

গাড়িটা ফটকের সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র জুপিটার আর পীট এগিয়ে গেল। এতক্ষণ তারা এই গাড়িটার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ওদের দু'জনের পরনেই রবিবারের পোশাক। ঝক-ঝকে সাদা স্যুট, গলায় টাই ঝুলছে। কেতাদুরস্তর সাজে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে জুপিটারকে।

জুপিটার বীরদর্পে এগিয়ে গেল গাড়িটা থামা মাত্র। তার পিছনে পিটার। গাড়ির সামনে দাঁড়ানো মাত্র দরজা খুলে দিলো সাদা পোশাকধারী ড্রাইভার। জুপিটার তাকালো তার দিকে। চাউনিতে প্রখর দৃষ্টি। আগেই বলেছি জুপিটারের হাবভাব বিজ্ঞের মতো। কাছে এসে সে বিজ্ঞভরা অহংকারি দৃষ্টিতে তাকালো চালকের দিকে। তার চাউনিকে লক্ষ্য করে ড্রাইভার লোকটি মাথার টুপি খুলে নিজের পরিচয় দিয়ে বললে—

আমার নাম মিষ্টার ওয়াদিটন!

ধন্যবাদ। একটু থেমে জুপিটার গাড়িতে উঠতে উঠতে বললে,

শোন মিষ্টার ওয়্যাদিটন, এখন থেকে তুমি আমাকে জোন্স না বলে জুপিটার বলে ডাকবে, ওই নামে সবাই আমাকে চেনে।

তাই হবে।

জুপিটার গাড়িতে ওঠামাত্র তার সঙ্গে সঙ্গে পীটও উঠে পড়লো। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওয়্যাদিটন এবার নিজের জায়গায় বসে বললে, এখন কোথায় যেতে হবে স্যার। তিরিশ দিনের জন্য এই গাড়িসহ আমি হলাম আপনার আদেশানুগত !

ধন্যবাদ। একটু থেমে জুপিটার গাড়ির পিছনে সীটে শরীর ছড়িয়ে দিয়ে বললে, শোন ওয়্যাদিটন, আমার এখুনি বেরুনোর দরকার। খুব তাড়াতাড়ি আছে। তোমার জন্য অপেক্ষা করার মতো সময় আমি তোমাকে দিতে পারবো না, তাই এবার থেকে খবর পাওয়া মাত্র চলে আসবে, বলা থাকলো।

খুব ভাল কথা স্যার। বলুন এখন কোথায় যেতে হবে। জুপিটার এবার তাকালো ওয়্যাদিটনের দিকে। বললে ঠিক আগের মতো গাম্ভীর্য্য নিয়ে—তোমাকে এখনো আমার কিছু বলার আছে। বিশেষ করে একটা ব্যাপারে তোমাকে জানাতে চাই—তাহলো আমি আর দশজনের মতো গাড়িটা নিয়ে মজা করার জন্য ব্যবহার করবো না। আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছি, তাই গাড়িটাকে আমি সেই কাজেই ব্যবহার করবো।

জুপিটারের কথায় ড্রাইভার লোকটি এবার অবাক হলো। তাকালো বিস্মিত চোখে জুপিটারের দিকে। তারপর বললে, তা এখন আপনাদের কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

নিশ্চয়ই বলবো। আর শোন, আমাকে তুমি এখন থেকে অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করবে না। যতটুকু তোমাকে বলবো, ঠিক ততোটুকু জানার চেষ্টা করবে।

তাই হবে স্যার।

এবার জুপিটার তার কণ্ঠস্বরকে গাঢ় করে বললে, আমি গতকাল মিঃ আলফ্রেড হিচকককে টেলিফোন করেছিলাম। এখন আমরা বিশ্ববিখ্যাত ওই হলিউড স্টুডিওর দিকে যেতে চাই।

খুব ভাল স্যার।

জুপিটার এবার কোন জবাব দিলো না। তাকে নীরব থাকতে দেখে ওয়ার্দিটন গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিলো। ভারি অদ্ভুত ধরনের গাড়ি এটা, গাড়িটার অধিকাংশ অংশ সোনার পাত দিয়ে মোড়া। বিশেষ করে গাড়িটার বডি, দরজা, জানলার ফ্রেম সবকিছু। তাছাড়া গাড়িটা আকারেও কিছুটা বড়। সব রকম ব্যবস্থা আছে গাড়িটার মধ্যে। এই গাড়িটাকে অটো কোম্পানী যে বিজ্ঞাপনের জন্য সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকে তা বেশ বোঝা যায়। তবে গাড়ির মডেল যথেষ্ট পুরনো ধরনের। বিশেষ করে সামনের হেড লাইট দুটো বড় আকারের যা আগের দিনের সাক্ষর বহন করছে।

প্রমোদ গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে ড্রাইভার ওয়ার্দিটন কাঁধের ওপর থেকে ঈষৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললে জুপিটারকে—

এই গাড়ির মধ্যে একটা টেলিফোন ও ছোট্ট রিফ্রেসমেন্ট রুম আছে, প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারেন।

ধন্যবাদ।

অস্ফুট স্বরে জবাব দিলো জুপিটার। তারপর নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে টেলিফোনটা খুঁজে বার করলো। ভারি অদ্ভুত ধরনের টেলিফোন। কোন রকম ডায়াল প্লেট নেই, কেবলমাত্র একটা সোনার পুসার আছে, যা টিপলেই অন্যপ্রান্ত থেকে শোনা যাবে অপারেটরের কণ্ঠস্বর। জুপিটার ভাল ভাবে লক্ষ্য করলো।

পীট অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। অস্ফুট স্বরে বললো—

ভারি অদ্ভুত তো, এক বোতাম টেপাতেই কাজ হবে।

হ্যাঁ। মোবাইল টেলিফোনের এটাই নিয়ম। একটু হেসে জুপিটার বললে, ভালই হলো, জানা থাকলো টেলিফোনের কথা। প্রয়োজনে কাজে লাগবে। কথা বলে আবার তারা এসে বসলো নিজেদের জায়গায়। তীব্র গতিতে পাহাড়ি সরু সর্পিল রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে তখন রোলস রয়েস।

বাইরের দিকে তাকিয়েছিল পীট। জুপিটার নিজের জায়গায়

অর্ধশায়িত। আধবোজা চোখে সে মনে হয় কিছু একটা ভাবছিল নিজের মনে।

একসময় জুপিটারের নজরে পড়লো বিরাট একটা প্রাচীর ঘেরা জায়গা, অনেক উঁচুতে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে বড় একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আছে—ওয়ার্ল্ড স্টুডিও।

রাস্তার ধার ঘেঁসে পাঁচিল চলেছে। জুপিটার লক্ষ্য করছিল। বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে পাঁচিলটা ঘেরা। একসময় ধীরে ধীরে বড় লোহার একটা গেট চোখে পড়লো। গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে রোলস রয়েস।

এতক্ষণ নির্বিঘ্নে গাড়ি ছুটছিল। বড় গেট পার হয়ে যাওয়ার মুখে প্রথম বাধা পেল রোলস রয়েস।

এক মিনিট দাঁড়াবেন স্যার।

গাড়ির গতি কমিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো ওয়ার্দিটন।

কি ব্যাপার?

কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?

কথা বলতে বলতে গেটের সামনে পাহারারত দারোয়ানটা এগিয়ে এলো গাড়িটার দিকে। লোকটিকে কাছে আসতে দেখে সহজ গলায় ওয়ার্দিটন বললে, মিষ্টার আলফ্রেড হিচককের সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি।

আপনাদের গেটপাস আছে?

গেটপাস! গেটপাস কি হবে, আমাদের দেখা করার জন্য গেটপাসের কোন দরকার নেই। তাছাড়া আমার মনিবের সঙ্গে তার টেলিফোনে কথা হয়েছে।

ড্রাইভারের কথা শুনে দারোয়ান লোকটি যেন এবার একটু থমকালো। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বার করার চেষ্টা করলো জুপিটার। তাকালো একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দারোয়ানের দিকে। তারপর গম্ভীর গলায় বললে, কি ব্যাপার হে, অযথা দেরী করাচ্ছ কেন?

ভিতরে যাওয়ার জন্য আপনাদের পাস আছে কিনা জানতে চাইছি।

বললাম তো আমাদের টেলিফোনে বলা আছে।

বাজে কথা। সে রকম কোন এপয়েন্টমেন্ট থাকলে আমি জানতাম।

কি করে ?

আমার মিষ্টার হিচকক বলে রাখতেন তাহলে ?

জুপিটার বুঝলো সহজে লোকটা ছাড়বে না। এবার সে ভারি অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাটকীয় এক মুহূর্তের অবতারনা করলো। পীট অবাক হলেও, মুখ খুললো না। জুপিটারকে সে চেনে। জানে, জুপিটার প্রয়োজনে ভাল অভিনয় করতে পারে। বিশেষ করে মুখের চেহারা আর বাচনভঙ্গি বদলাতে সে খুব চোস্ত। জুপিটার এবার উঠে গেল টেলিফোনের কাছে। রিসিভারটা হাতে তুলতে তুলতে বললে, ঠিক আছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমায়। আমি টেলিফোনে কাকাকে বলছি। তুমি অযথা আমাদের সময় নষ্ট করছ।

গাড়িতে বসেই সোনার টেলিফোনে জুপিটারকে ফোন করতে দেখে বেশ একটু অবাক হলো দারোয়ান লোকটি ! তার কাছে ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর বলে মনে হলো। লোকটি যে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হলো না জুপিটারের।

সত্যি জুপিটারের এই নাটকীয় ভঙ্গিমায় কাজ যে হলো না তা নয়। টেলিফোনে সে কোন কথা বলার আগেই দারোয়ান লোকটি কি ভেবে এবার পথ ছেড়ে দিয়ে বললে, থাক স্যার, দয়া করে আর ফোন করবেন না। আপনারা ভিতরে চলে যান।

ধন্যবাদ। তারপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে বললো, চলো।

গাড়ি ছুটলো আবার। সামনে পাথর কুচির রাস্তা। চারদিক সাজানো গোছানো—চকচক করছে। দু'ধারে সবুজ কার্পেট বিছানো লন। মাঝে মাঝে সুন্দর কাঠের তৈরি সিনেমা ধরনের ছোট ছোট খুপরি ঘর চোখে পড়লো।

পাথর কুচির রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে তখন। স্টুডিওর মধ্যে লক্ষ্য করছিল জুপিটার হিচককের নিজস্ব বাংলোটিকে। প্রতিটি প্রযোজকের নিজস্ব বাংলো থাকে স্টুডিও চত্বরে, সেটাই তাদের অফিস ঘর।

একসময় তারা এসে পৌঁছলো সুন্দর একটা বাংলোর সামনে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়ালো জুপিটার। না, ভুল হয়নি চিনতে। বাংলো দরজার সামনে একটা রূপোলী প্লেট বসানো। তাতে ঝকমক করছে মিষ্টার আলফ্রেড হিচককের নাম।

গাড়ি থামা মাত্র জুপিটার নেমে পড়ল। ওর পিছনে পীট। গাড়ি থেকে নেমে জুপিটার বললে ওর্যাদিটনের দিকে তাকিয়ে, আমাদের জন্য এখানেই তুমি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা কর ওর্যাদিটন। হয়ত কিছুক্ষণ তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আচ্ছা স্যার।

এবার জুপিটার পীটকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল বাংলোর দিকে। কাঠের সিঁড়ি টপকে এসে দাঁড়ালো দু'জনে কাঁচের ঘরের সামনে। ভিতরে বসে থাকা হেনরিটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকা মাত্র হেনরিটা তাকালো তাদের দিকে। মনে হয় সে টেলিফোন করছিল কাউকে। ওদের দেখে রিসিভার নামিয়ে রেগে সবিস্ময়ে বললে হেনরিটা, ও তোমরা, তোমরাই তাহলে মিষ্টার হিচককের ভাইপো বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছ। ঠিক আছে, দাঁড়াও এবার দেখাচ্ছি আমি তোমাদের, স্টুডিওর পুলিশ কাছেই আছে, আমি ডাকছি তাদের।

কথাটা বলে মেয়েটি দ্রুত হাতে রিসিভার তোলার চেষ্টা করলো।

শোন হেনরিটা, দাঁড়াও।

জুপিটারের কথায় হেনরিটা তাকালো তার দিকে। তারপর ভুরুযুগলে টান দিয়ে বললে, দাঁড়াবো কেন, কিসের জন্য ? দারোয়ানকে তোমরা মিথ্যে পরিচয় দিয়েছ ' দাঁড়াও না, দেখ এবার পুলিশ ডেকে তোমাদের কি করি !

পীট এবার মুখ খুললো। বললে হাতে ঘুসি পাকিয়ে—

এত চিৎকার করছ কেন, আমরা কি কাউকে মারধোর করছি।

তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না। আজ তোমাদের বুঝিয়ে দেব, এটা তোমাদের আড্ডাখানা নয়, আমাকে এখানেও তোমরা জ্বালাতে এসেছ দেখছি।

ঠিক তা নয় হেনরিটা।

তাহলে!

উত্তেজিত না হয়ে আমার কথা শোন। কথাটা বলে জুপিটার তাকালো হেনরিটার দিকে। তারপর হাত থেকে টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিয়ে নামিয়ে রাখলো টেবিলের একধারে। কোন প্রতিবাদ করলো না হেনরিটা। কিছুটা অপ্রতিভ সে। জুপিটার ঠাণ্ডা গলায় বললে, তুমি তো জানই আমি ভাল অভিনয় করতে পারি। আমি এখানে এসেছি মিষ্টার হিচককে আমার অভিনয় প্রতিভা দেখাতে। শুনলাম তিনি নাকি তার আগামী ছবির জন্য একটা ছেলে খুঁজছেন, তাই আমাদের আসা। আমার মনে হয় মিষ্টার হিচককে আমি সন্তুষ্ট করতে পারবো।

তার কথা শোনার পর হেনরিটা তাকালো তার দিকে। মুখচোখে তখনও তার উত্তেজনা মাখানো। বললে অপ্রতিভ স্বরে, তাহলে—তুমি—তুমি।

জানি কি বলবে, তোমার দারোয়ান ঠিক বুঝতে পারেনি আমার কথা। আমি কাকা বলতে মিষ্টার হিচককে বোঝাই নি, জোন্সকে বুঝিয়েছি। তাহলে বুঝতে পাচ্ছ দোষটা আমার নয়। আমি এখানে সত্যি সত্যি কেন এসেছি তাও বললাম। এই ধর আমাদের পরিচয় লেখা কার্ড, এবার তুমি—

জুপিটার কথা শেষ করতে পারলো না তার আগেই শুনতে পেল ভারি কণ্ঠের কথা।

কি ব্যাপার মিস লারসন?

তিনজনেই এবার তাকালো কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। জুপিটারের হাতে তার সেই কার্ড।

চিনতে অসুবিধে হলো না তাদের এই মানুষটাকে। ভারি জুতোর শব্দ তুলে ভদ্রলোক এগিয়ে আসতে আসতে বললেন—

কিছু ব্যাপার ঘটেছে কি। টেলিফোনে তোমার কোন সাড়া পেলাম না বলে, আমাকে আসতে হলো! কি ব্যাপার, হয়েছেটা কি?

মিষ্টার হিচককের কথায় হেনরিটা মুখ খুললে। নরম চাউনি দু'চোখে বুলিয়ে নিয়ে আমতা আমতা গলায় বললে, এই ছেলেরা আপনাকে কিছু দেখাতে চায়। মানে আমার মনে হয়, ব্যাপারটা খুব ইনটারেসটিং।

না, না এখন কারো কিছু দেখার মতো সময় আমার হাতে নেই। আমি খুব ব্যস্ত। ওদের তুমি চলে যেতে বলো।

মিষ্টার হিচকক কথাটা হেনরিটার উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিলেন।

কিন্তু স্যার আমি বলি কি, ব্যাপারটা একবার দেখলে পারতেন, মনে হয় আপনার ভাল লাগবে। মানে—

কথাটা শেষ করলো না হেনরিটা। জড়িয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। তাকালো সে মিষ্টার হিচককের দিকে।

হেনরিটা যে এতটা তাদের হয়ে বলবে এ যেন বিশ্বাস ছিল না জুপিটারের। পীট লক্ষ্য করছিল হেনরিটা কথা বলতে বলতে বার বার তাকাচ্ছিল জুপিটারের দিকে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগলো না তার। কি এমন দেখার আছে তার জুপিটারের মধ্যে।

হেনরিটার কথায় মিষ্টার হিচকক যেন কিছু ভাবলেন। তারপর নিজের মনে কিছু একটা ভেবে নিয়ে বললেন জুপিটার ও পীটের দিকে তাকিয়ে, ঠিক আছে। এসো তোমরা আমার সঙ্গে।

কথাটা বলে মিষ্টার হিচকক এগিয়ে গেলেন পিছনের একটা দরজার দিকে। জুপিটার ও পীট তাকে অনুসরণ করলো। পীট লক্ষ্য করছিল হেনরিটাকে। দরজাটা বন্ধ করছে সে।

দরজা পার হয়ে মিষ্টার আলফ্রেড হিচকক ওদের ভিতরের লনে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তিনজনে বেতের চেয়ারে বসলো।

হিচকক বললেন, বলহে ছেলেরা, কি তোমাদের বক্তব্য। আমি তোমাদের সঙ্গে মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বলার জন্য সময় দিতে পারি।

তাহলেই হবে স্যার। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা আপনাকে যা দেখাতে চাই দেখাতে পারবো।

কথাটা বলে জুপিটার একটা বিজনেস কার্ড এগিয়ে দিলো তার দিকে।

পীট বুঝতে পারলো জুপিটার মনে মনে তার পরিকল্পনা সাজিয়ে নিয়েছে।

খুব মন দিয়ে মিষ্টার হিচকক কার্ডটা দেখলেন। তারপর সকৌতুকে বললেন, সবই তো বুঝলাম, তোমরা একেকজন ইনভেসটিগেটার। তা তোমাদের ওই প্রশ্ন চিহ্নটা তো ঠিক বুঝলাম না? ওটা কি নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ব্যবহার করেছ।

না স্যার। ওটা আমাদের ট্রেডমার্ক—সাংকেতিক চিহ্ন।

তা প্রশ্ন চিহ্ন কেন?

এই কারণেই যে আমরা সবরকম কাজেই অভ্যস্ত। তাছাড়া কোন প্রশ্নের অর্থই হলো উত্তর খুঁজে পাওয়া। আমরা সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর বাতলে দেব।

আর কিছু?

হ্যাঁ! এই ধরনের চিহ্ন লোককে আমাদের বিষয়ে জানতে আগ্রহী করবে।

তুমি তো খুব বিজনেস্ মাইনডেড দেখছি।

তাছাড়া আর কি বিজনেসের লক্ষ্য আছে বলুন।

মিষ্টার আলফ্রেড হিচকক এবার তাকালেন জুপিটারের দিকে।

বললেন, তো আমার কাছে কি ব্যাপার?

শুনলাম আপনি নাকি একটা ভুতুড়ে বাড়ি খুঁজছেন। আপনার পরবর্তী ছবির জন্য। আমরা তিনজন ইনভেসটিগেটর এই কাজের দায়িত্ব নিতে চাই।

জুপিটারের কথায় হিচকক চমকালেন যেন। বললেন গম্ভীর গলায়, তা অসম্ভব। আর এই ব্যাপারে আমার নিজস্ব লোক আছে তারা সন্ধান করছে। তাছাড়া লোকেসন আমার ঠিক হয়ে গেছে। আগামীকাল আমার বোসটন শহরে এই ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। সে একটা লোকেসন দেখাবে।

আমরা যদি আপনাকে এখানে মানে এই কালিফোর্ণিয়াতেই জায়গা দেখে দিই। আমার মনে হয়, এখানে ছবির কাজ করলে খরচও আপনার কম হবে অনেক।

না তা হয় না। আমি দুঃখিত।

এরজন্য আমাদের টাকা দিতে হবে না স্যার।

সে কি?

হ্যাঁ। প্রথম প্রথম এই সব কাজ করতে গেলে ভাললোকের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট, আগে তো কিছু নামী লোকের কাজ করে দিয়ে গুডউইল করতে হবে তবে তো ব্যবসা। অন্তত পৃথিবী বিখ্যাত গোয়েন্দারা তাই বলেছেন। যেমন ধরুন, শার্লক হোমস, এলারী কুইন-এর কথা। তাই বলছিলাম আপনাকে সাহায্য করলে আমরা তিনজন গোয়েন্দাই উপকৃত হবো।

জুপিটার-এর কথাগুলো মিষ্টার হিচকক যে মন দিয়ে শুনছিলেন না বোঝা গেল। তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একসময় বললেন—আর কিন্তু সময় নেই।

তাহলে?

তোমরা এখন যেতে পার আমি মিস লারসনকে বলছি তোমাদের দরজাটা দেখিয়ে দিতে।

কথাটা বলে মিষ্টার হিচকক দাঁড়িয়ে ওঠামাত্র ওরা দুজনেও উঠে পড়লো। তারপর জুপিটার বললে, হিচককের দিকে তাকিয়ে, ধন্যবাদ স্যার। তাকে দরকার হবে না, আমরা নিজেরাই চলে যেতে পারবো।

কথা বলে তারা আর দাঁড়ালো না। এগিয়ে গেল দরজার কাছে।

দরজার কাছে পৌঁছনো মাত্র তারা শুনতে পেল হিচককের কণ্ঠস্বর, শোন।

থমকে দাঁড়ালো পিছু ডাক শুনে। তাকালো দুজনে প্রায় একসঙ্গে। এগিয়ে এলো আবার তারা দাঁড়িয়ে থাকা হিচককের দিকে।

কি ব্যাপার স্যার?

কাছে আসতেই জুপিটারকে লক্ষ্য করে হিচকক বললেন—আমার মনে হয় তোমাদের এখনও সব কথা বলা হয় নি। কিছু একটা বাকি আছে। একটু থেমে বললেন, মিস লারসন যে জিনিসটা দেখার জন্য

আমাকে বলেছে, তা কিন্তু তোমরা এখনো আমাকে দেখাও নি—নিশ্চয়ই ওটা ওই একটা সামান্য কার্ড নয়, যা তাকে মুগ্ধ করেছে।

ঠিক তাই স্যার!

তাহলে।

এবার জুপিটার তার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দ্রুত বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার মিস লারসন আপনাকে ঠিকই বলেছেন। আমি আমার মুখের চেহারাটা যে কোন সময় বড়মানুষের মতো বদলাতে পারি, সেইসঙ্গে আমার গলার স্বরটাও। সে আমার এই বদলানো মুখের চেহারা দেখেই অবাক হয়ে আপনাকে বলেছে।

তাই নাকি! হিচকক তাকালেন। দু'চোখে তার গভীর দৃষ্টি। সকৌতুকে বললেন—কি রকম নিজেকে বয়স্ক করতে পার দেখি একবার।

দেখবেন স্যার। (উৎসাহী হলো জুপিটার)।

নিশ্চয়ই।

বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক এবার তার প্রখর দৃষ্টিকে সজাগ রাখলেন জুপিটারের দিকে। লক্ষ্য করলেন জুপিটারের মুখের চেহারাটা ভারি অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। ঠিক একটা বয়স্ক লোক বলে মনে হচ্ছে তাকে।

কি দেখছেন মিষ্টার হিচকক। এবার কি আপনি আমার ভিন্ন রকমের কণ্ঠস্বর শুনতে চান। যদি চান তো শুনুন তাহলে।

কথাটা শেষ করে জুপিটার তার মুখের চেহারা বদলে কণ্ঠস্বরকে বেশ অন্যরকম করে তুললো। তারপর বললে, মিষ্টার হিচকক কিছুদিন হলো আপনি ছোট ছেলেদের নিয়ে একটা ছবি করার কথা ভাবছেন তাই না। শুনুন আমি সব কিছু দেখতে পাই—তাই বলছি যদি আপনি সেই চেষ্টা করেন তো —।

অবাক হয়ে মিষ্টার হিচকক লক্ষ্য করছিলেন জুপিটারকে। তার সুন্দর মুখের চেহারা বিশ্রিভাবে বদল হলো। তার কাছেও যে ব্যাপারটা বেশ বিস্ময় লেগেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। বললেন তিনি বিরক্তমাখা স্বরে—আরে বাবা, ঠিক একটা দৈত্যের মতো দেখতে লাগছে। ওহে ছোকরা বন্ধ কর এবার। আর তোমাকে ওই ভয়ংকর মুখটা দেখাতে হবে না।

মিষ্টার হিচককের কথা শোনা মাত্র মুহূর্তে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিলো জুপিটার। বললে, কি রকম দেখলেন স্যার।

আশ্চর্য!

খুব মজার ব্যাপার তাই না স্যার। আমার কাছেও ব্যাপারটা খুব মজার বলে মনে হয়। বন্ধুরা প্রায়ই আমাকে এই ভঙ্গিতে দেখতে চায়। এইরকম ভাবে মুখভঙ্গি নিয়ে কথা বলতে বলে।

কাজটা ভাল নয়। তবে এটা ঠিক ব্যাপারটা খুব নিখুঁত হয়নি। বার কয়েক করলে নিখুঁত হয়ে যাবে।

থাক খুব হয়েছে। একটু থেমে মিষ্টার হিচকক জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন, যদি আমাকে কথা দাও—এমন আর কখনও করবে না, তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিতে পারি।

ধন্যবাদ মিষ্টার হিচকক, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। একটু থেমে জুপিটার বললো—তাহলে ভুতুড়ে বাড়ি খোঁজার দায়িত্বটা কি আমরা পাব স্যার?

নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু আমার কাছে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা যেন মনে থাকে। যদি কথা দাও তো এই বাড়ি খোঁজার দায়িত্ব তোমাদের আমি দিতে পারি। কি রাজি?

জুপিটার হাসলো। বললে, কথা দিলাম স্যার।

তাহলে আমিও তোমাদের কথা দিলাম।

ধন্যবাদ।

করমর্দনের জন্য হাতটা জুপিটারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন হিচকক।

বিকেল প্রায় শেষ হয়ে আসছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে উপচে পড়ছে শেষ বিকেলের রোদ, ঝলমল করছে চারদিক। বাইক দাঁড় করিয়ে বব এগিয়ে গেল গ্রীন গেট ওয়্যানের দিকে।

ইয়ার্ডের একদিকে চোখ রেখে বব দেখতে পেল জুপিটারের কাকীমা খুব চাপা স্বরে কথা বলছে একজনের সঙ্গে। লোকটিকে বব চেনে, হেনস্। মিঃ জোন্স-এর কারবারের বহু কালের সঙ্গী। মনে হয় মিসেস জোন্স তাকে কিছু একটা করবার জন্য আদেশ করছেন।

বব এগিয়ে যায়। ওকে কেউ দেখতে পায় নি। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো বব। তারপর চকিতে চারদিক দ্রুত নজরে দেখে নিয়ে দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লো ভিতরে।

জুপিটার তাকালো।

বড় একটা টেবিলের এক পাশে চেয়ার নিয়ে পা তুলে বসেছিল জুপিটার। তার কিছুটা দূরে বসে পীট। ববকে ভিতরে ঢুকতে দেখে জুপিটার বললে সহজ গলায়, খুব দেরী করলে বব।

কথা সে এমন ভাবে বললে যেন বব-এর খেয়াল নেই সময়ের দিকে। বব মাথা নেড়ে কিন্তু নিজের দেরী হওয়ার ব্যাপারটাকে সমর্থন করে বললে, জানি দেরী হয়েছে। লাইব্রেরী থেকে তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টাও করেছিলাম ; কিন্তু দেরী হয়ে গেল।

জুপিটার তাকালো।

স্পষ্ট চাউনি। বললে ; কিছু পেয়েছ ?

হ্যাঁ, সাধ্যমতো তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করেছি, একটু থেমে বললে, একটা 'ভয়ঙ্কর দূর্গের' খবর এনেছি।

ভয়ঙ্কর দূর্গ। অস্পষ্ট স্বরে কথাটা উচ্চারণ করে ববের দিকে তাকালো জুপিটার। তারপর বলল—ভয়ঙ্কর দূর্গ এই নামটাই আমার পছন্দ নয়।

আরে আগে শুনবে তো ব্যাপারটা কি, একটু থেমে বব বললে ; আমি যে দূর্গটার খবর এনেছি, সেটি খুবই ভয়ঙ্কর। এই দূর্গে নাকি মানুষ এক রাত্তিরও কাটাতে পারেনি কখনও। সব শেষে এই দূর্গে পাঁচজনের একটা পরিবার রাত কাটাবার চেষ্টা করেছিল—শোনা যায় তারা আর দূর্গের বাইরে ফিরে আসেনি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন জুপিটারের চিন্তার মধ্যে এলো। উৎসাহ

বোধ করলো সে। তারপর ফাঁকা একটা চেয়ার দেখিয়ে ববকে বসতে বলে বললে : একেবারে গোড়া থেকে শুরু কর শুনি।

বেশ তাহলে বলি শোন।

কথাটা বলে বব বসলো চেয়ারটার ওপর। তারপর শরীরটাকে সামান্য একপাশে কাঁত করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করলো একটা বাদামী রঙের খাম। জুপিটার লক্ষ্য করছিল।

বব এবার খামটা হাতে নিয়ে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখ প্রথম থেকে ঘটনা শুরু করতে গেলে, আমার সবার আগে বলতে হয়স্কিনি নোরিসের কথা। সারাটা দিন ছোকরা আজ আমার পিছনে আঠার মতো লেগেছিল, একটু কাজ করতে দেয়নি ভাল মতো।

ববের কথা শেষ হতে পারলো না, কথা বললে পীট। উত্তেজিত গলায় বললে : হতভাগা একটা, পরের ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যাস দেখছি ছাড়লো না এখনো। না—একদিন ভাল মতো দাওয়াই দিতে হবে দেখছি।

পীটকে উত্তেজিত হতে দেখে বব মৃদু হাসলো তার দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে ; মারধোর পরে হবে, আগে শোন যা বলি। কথাটা শেষ করে বব এবার তাকালো জুপিটারের দিকে তারপর বললে, আজ লাইব্রেরীতে পা দিতে না দিতেই আমার সঙ্গে অযথা খেজুরে আলাপ করতে এগিয়ে এলো নোরিস। তার আলোচনার প্রথম কথাই ছিল জুপের পুরস্কার জিতে গাড়ি পাওয়ার কথা। সে বার বার আমার কাছ থেকে জানতে চাইছিল গাড়িটা নিয়ে জুপ কিভাবে ব্যবহার করতে চায়

জুপিটার হাসলো। তারপর পরম বিজ্ঞের মতো পা দুলিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, ছোকরা আমাকে ভীষণ ভয় পায়। আর পাবে নাই বা কেন বল, স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এতদিন তো গাড়ি একাই তার ছিল। এর জন্য কি দেমাকই না ছিল নোরিসের। একটু থেমে এবার জুপিটার বললে ; আসলে কি জানো তো ও নিজে গাড়ি চালাতে পারে না, ড্রাইভারের ওপর তাকে নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই গাড়ি

নিয়ে আমরা যা করতে পারবো, ও তা পারবে না। তারপর বলো বব— শুনি, কি হলো।

বব আবার বলতে শুরু করলো।

যাইহোক লাইব্রেরীতে পৌঁছে আমি ক্যাটালগ দেখে পুরনো কাগজপত্র বার করে টেবিলে বসে কাজ শুরু করেছিলাম। খানিকবাদে দেখলাম নোরিস এসে বসলো আমার পাশে। প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছিল আমার কাগজগুলোর দিকে। আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম ও সব কিছু পড়তে পাচ্ছে। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। শেষে একসময় সে আমাকে প্রশ্ন করলে; আমি এইসব কিসের জন্য করছি। আমি তখন তাকে বললাম; ব্যাপারটা জুপিটারের দরকার, তার জন্যই আমি তথ্য সংগ্রহ করছি। কথাটা বলে আমি অন্য দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যাতে সে ঠিক-ঠাক কিছু না বুঝতে পারে।

আচ্ছা বেশ, তারপর কি হলো বলো?

এবার সে বললে; তুমি যে বিজনেস কার্ডটা আমায় দিয়েছিলে, সেই কার্ডটা আমি টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। ওই কার্ডে তোমার হাতের লেখা ছিল, ভয়ঙ্কর দুর্গ, মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার।

বব তাকালো জুপিটারের দিকে। আলতো ভাবে মাথা নাড়িয়ে বব বললে—হ্যাঁ মনে আছে। তারপর একটু থেমে ববের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জুপিটার বললে—

খানিকবাদে খোঁজ করতে গিয়ে সেই কার্ড তুমি আর দেখতে পেলে না। এই তো?

ঠিক তাই, তা তুমি জানলে কি করে?

ববের প্রশ্নে মৃদু হাসলো জুপিটার। বললে, কার্ডটা না হারালে, তুমি নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গ তুলতে না। আর তাছাড়া তুমি যে পরে লাইব্রেরীর সব কাগজপত্রও খুঁজে দেখেছ তাতেও সন্দেহ নেই।

একেবারে সত্যি কথা। আমি কার্ডটার জন্য গোটা লাইব্রেরী রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু খুঁজে পাইনি। তবে আমার ধারণা

এই কার্ডটা নোরিসই নিয়ে গেছে। কারণ খানিকবাদে সে আমার পাশ থেকে চলে গিয়েছিল।

এবার জুপিটার একটু নড়ে বসলো। বব ব্যাপারটা গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করলেও জুপিটার খুব একটা গুরুত্ব দিলো না। বরং সহজ গলায় ববের দিকে তাকিয়ে বললে, শোন বব, আমাদের কাছে নোরিসের খবরটা খুব একটা জরুরী নয়, যতটা জানার দরকার ওই ভয়ঙ্কর দুর্গের বিষয়। তুমি বরং সেই কথাই বলো।

বব জুপিটারের মৃদু ধমকে থমকে গেল যেন। তারপর নিজেকে সঠিকভাবে গুছিয়ে নিয়ে বললে, তাহলে শোন যা বলি।

বব বলতে শুরু করল ভয়ঙ্কর দুর্গের কথা। দুর্গটা হলিউডের কাছাকাছি একটা সংকীর্ণ গিরিখাদের কাছে অবস্থিত। জায়গাটা খুবই নির্জন। লোকে এই জায়গাটাকে কালো গিরিখাদ বলেই চেনে। দিনের সূর্য বড় একটা এখানে প্রবেশ করে না শোনা যায় এই ভয়ঙ্কর দুর্গের আসল নাম টেরিল দুর্গ। মিষ্টার স্টিপেন টেরিল নামে এককালের বিখ্যাত একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা এই দুর্গটিকে নির্মাণ করেছিলেন। তাও প্রায় বহু বছর হয়ে গেল। টেরিল ছিলেন সেই সময়কার বিখ্যাত অভিনেতা যখন সিনেমা কথা বলতো না। শোনা যায় ভদ্রলোক নাকি বিভিন্ন ছবিতে নিজেকে বিভিন্ন রূপে সাজাতেন। কখনও তাকে দেখা যেত নেকড়ের পোশাকে, কখনও বা রক্তচোষা দৈত্যের ভূমিকায়। এই ধরনের ভয়াবহ চরিত্রে রূপ দেওয়ার ফলে তার মধ্যে একটা অদ্ভুত নেশা জন্মেছিল। তিনি সেই নেশায় অদ্ভুত একটা বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বাড়িটাকে দেখতে অনেকটা পুরনো আমলের দুর্গের মতো। আর তার দেয়ালে ছিল অসংখ্য সব বিচিত্র ছবি, পোশাক-পরিচ্ছদ, নিজের বিভিন্ন রূপসজ্জায় তোলা ছবিগুলো, আর শিকারের মমি।

দারুণ!

ববের কথার মধ্যে জুপিটার কথাটা ছুঁড়ে দিল। বোঝা গেল সে যেন ভিতরে ভিতরে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। পীট-এর কাছে কিন্তু

জুপিটারের এই উক্তি খুব একটা মনপূতঃ হলো না। সে দ্রুত জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললে, দারুণ বললে কিসের জন্য, এখনো তো, ভয়ঙ্কর দুর্গের ভয়ঙ্করত্বের কোন প্রমাণ পাইনি।

তা ঠিক, এবার আমি সেই কথায় আসছি।

বব পীটকে শান্ত করে আবার প্রবেশ করলো নিজের বক্তব্যের মধ্যে।

স্টিপেন টেরিল-এর জনপ্রিয়তা একসময় হয়ে উঠেছিল আকাশচুম্বি। লোকে তাকে বিভিন্ন রূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্য তাকে নতুন নাম দিয়েছিল। আর তার সেই নাম ছিল—বহুরূপী। এদিকে বিজ্ঞান এগুলো আরো একধাপ। নির্বাক ছবির আত্মপ্রকাশ ঘটলো সবাক ছবির মধ্যে। সিনেমার ছবিরা কথা বলা সুরু করা মাত্র, স্টিপেন টেরিলের বাজার গেল নষ্ট হয়ে। সবাক ছবিতে তার কণ্ঠস্বর ধরা পড়লো।

কি রকম ?

কি রকম আবার খনার মতো নাকে নাকে কথা বলা। উঁচু স্বরে কথা বললে কণ্ঠস্বর আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতো তার।

আশ্চর্য, লোকটা তাহলে একটা জ্যান্ত দৈত্য ছিল বলো! দৈত্যদের শুনেছি এই ধরনের কণ্ঠস্বর হয়ে থাকে।

তা হবে। অতো কথা আমি জানি না। আমি শুধু বলতে পারি এরপর স্টিপেন টেরিল কি করেছিলেন।

কি করেছিলেন ?

কি আবার করবেন, তিনি ছবি তোলা বন্ধ করে দিলেন, বাড়ির চাকরদের ছাটাই করে দিলেন। এমন কি তার প্রিয় বন্ধু মিষ্টার জোনাথন রেক্সকেও তিনি বিদায় করে দিলেন তার কাছ থেকে। এরপর বড় একটা তাকে কেউ লোকালয়ে দেখেনি কখনও। অধিকাংশ সময় তিনি টেলিফোন ও চিঠিতে কাজ সারতেন। এর ফলে ধীরে ধীরে মানুষটা একসময় সরে গেলেন লোকচক্ষুর আড়াল থেকে।

এই পর্যন্ত বলে বব এবার থামলো একমুহূর্তের জন্য। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, এমনি একটা দিনে, হঠাৎ একদিন তার পুরনো গাড়িটাকে লোকে আবিষ্কার করলো হলিউড-এর মাইল কুড়ি উত্তরে।

গাড়িটা রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে এমনভাবে উল্টে পড়েছিল, যে আর একটু হলেই তা সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যেত!

তা নয় বুঝলাম, কিন্তু এর সঙ্গে স্টিপেন টেরিলের কি সম্পর্ক।

কথাটা বললে পীট।

বব তাকালো তার দিকে। তারপর বললে, গাড়ির নম্বর থেকে পুলিশ প্রথম জানতে পারলো গাড়ির মালিককে। তারা দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়ির চালককে খুঁজে পেল না। সকলের ধারণা ছিল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, মনে হয় তিনি সমুদ্রের জলে ডুবে গেছেন।

এই গাড়িতে যে গাড়ির মালিক নিজেই ছিলেন, ওটা বোঝা গেল কি করে?

পীট আবার প্রশ্ন করলে। বব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলো। বোঝা হয়ত স্পষ্ট যায়নি, সবটাই অনুমান। একটু থেমে বব বললে, পুলিশ পরে কালো সেই ভয়ঙ্কর গিরিখাদ সংলগ্ন দুর্গটিকে তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেছিল! কিছুই পায়নি। কেবল দেখেছিল দুর্গের দরজাগুলো খোলা আছে, ভিতরে কেউ নেই। পরে তারা ঐ দুর্গের লাইব্রেরী রুম থেকে একটা চিরকুট উদ্ধার করে।

কথাটা বলে বব এবার তার হাতের কাগজটা মেলে ধরলো। পড়তে লাগলো কিছুটা উচ্চস্বরে 'পৃথিবীর কোন মানুষ হয়ত আর আমাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে না। তবে আমার আত্মা এখান থেকে চলে যাবে না কখনও। এই দুর্গের চারদিকেই প্রতিমুহূর্তে সে থাকবে। আমার আত্মার সঙ্গে এই দুর্গের মধ্যেই হবে আমার অবস্থিতি। ইতি—স্টিপেন টেরিল।'

ববের কথাটা শেষ হতে পারলো না। তার আগেই পীট বলে উঠলো, ও হো, এই ঘটনাটা যেন আমি শুনেছি আগে। তবে ঠিক এই রকম নয়।

বব এবার অসন্তুষ্ট চোখে তাকালো পীটের দিকে। বললে, দাঁড়াও আগে আমায় শেষ করতে দেবে তো। একটু থেমে সে বললে, পুলিশ তাই দুর্গটাকে বহুদিন তল্লাসী করেছে। তারা টেরিলের ওই চিরকুট

ছাড়া আর কিছুই পায়নি। পরে ব্যাপারটা জানা গেল; স্থানীয় একটা ব্যাঙ্কের কাছে টেরিলের ওই বাড়িটা মর্টগেজ দেওয়া ছিল বেশ মোটা টাকায়। সেই কারণেই তার মৃত্যুর পর ব্যাঙ্ক কিছুদিন অপেক্ষা করে, ওই বাড়ির জিনিসগুলো দখল করার জন্য লোক পাঠায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ব্যাঙ্ক থেকে যে লোকগুলোকে ওই বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল টেরিলের জিনিসগুলো বার করে আনার জন্য, তারা সেই কাজে সমর্থ হয়নি শেষ পর্যন্ত। অদ্ভুত এক ভয় ভয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে! পরে তারা জানায়, ওই বাড়িতে তারা অদ্ভুত কিছু ভৌতিক জিনিস দেখেছে, আর শুনেছেও। তবে সঠিক ভাবে ব্যাপারটা তারা বুঝিয়ে বলতে পারেনি। পরে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ব্যাঙ্ক থেকে বাড়িটাকে অল্প টাকায় বেচে দেওয়া হয়। অথচ আশ্চর্য, এই বাড়িতে এখনো পর্যন্ত কেউই একটা রাতও পুরোপুরি কাটাতে পারেনি। আর কেউ যেতেও চায় না। যারা দু'চারজন গিয়েছিল তারা বলেছেন; বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলে অদ্ভুত একটা ভৌতিক অনুভূতি তারা অনুভব করেন, বেশীক্ষণ থাকা যায় না।

বব থামতেই পীট বললে; তাই কি, আমি কিন্তু শুনেছিলাম একটা এজেন্সি দল নাকি থাকার চেষ্টা করেছিল, তবে তারা সকলেই খাদে পড়েছিল ভয় পেয়ে।

পীটের কথা জুপিটারের যেন ভাল লাগলো না। কড়া চোখে একবার পীটের দিকে তাকিয়ে বললে সে ববকে লক্ষ্য করে—তারপর কি হলো বলো।

জুপিটারের আদেশ পেয়ে বব বলতে শুরু করলো পুনরায়।

এরপর অনেক লোক ওই বাড়িতে রাত্রি বেলা থাকার চেষ্টা করেছে কেউ পারেনি। একজন চলচ্চিত্রের অনামী মহিলা নাকি নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার আশায় একবার চেষ্টা করেছিল রাতে ওই বাড়িতে একলা থাকতে, কিন্তু মাঝরাতের পর তিনি অসম্ভব ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে যান। মহিলার দাঁতে দাঁত এমন ভাবে লেগে গিয়েছিল যে বহুদিন তিনি কথা বলতে পারেন নি। তবে পরে তার অভিজ্ঞতা থেকে

জানা যায়, তিনি বলেছেন ওই বাড়িতে তিনি স্পষ্ট এক নীলাভ ছায়ামূর্তি দেখেছেন।

বব এবার থামলো।

জুপিটার এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো। বব চুপ করতেই সে বললো তার দিকে তাকিয়ে, এবার তাহলে আমাদের অভিজ্ঞতার পালা কি বলো। বাকি কাজটুকু আমাদেরই সমাধা করতে হবে।

আমার মনে হয় ঘটনা এখনো শেষ হয়নি।

আরো কিছু বলা বাকি আছে ববের।

কথাটা বললো পীট জুপিটারকে লক্ষ্য করে। পীটের কথায় জুপিটার এবার তাকালো ববের দিকে। বললো ; কি হে বব, আরো কিছু আছে নাকি হে তোমার বলার মতো।

হ্যাঁ আছে। আর একটা ঘটনা। যদিও ঘটনাটা ঠিক আগের মতো, তবু ব্যাপারটা আমাদের সকলের জানা দরকার।

কি বলো শুনি তাহলে!

ইষ্ট থেকে পাঁচজনের একটা পরিবার এসেছিল এই বাড়িতে থাকার জন্য। ব্যাঙ্ক থেকে বলা হয়েছিল যদি কেউ এক রাত্তির এই বাড়িতে থাকতে পারে, তবে তাকে এক বছরের থাকা খাওয়ার খরচ দেওয়া হবে।

ইষ্ট পরিবারের পাচজনের দলটি মাঝরাত পর্যন্ত ভালই ছিল। তারপর তারা একই ভয়ের তাড়নায় বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে।

তারা কিছু দেখেছিল।

প্রথমটায় কিছু দেখতে পায়নি। পরে তারা বলেছে অসংখ্য অশরীরি তারা দেখতে পেয়েছে। শুধু তাই, পাইপ অরগ্যান থেকে এখনো নাকি সুর ঝঙ্কার শোনা যায়। অবশ্য পড়ে একদল প্রফেসর ব্যাপারটা তদন্তের জন্য গিয়েছিলেন। তারা বলেছেন ; ওই বাড়িতে তারা কিছু দেখতে বা শুনতে পাননি। তবে সব সময় তারা অদ্ভুত একটা আতঙ্কের অনুভূতি অনুভব করেছেন—যা অদ্ভুত বিব্রতকর। তারাও এই অনুভূতিতে অস্বস্তিবোধ করে মাঝরাতের পর বাড়িটার বাইরে চলে আসেন।

ববের বক্তব্য শেষ হতেই জুপিটার তাকালো। বললে, আর কিছু বলার আছে তোমার?

না তা নেই। তবে এইটুকু বলতে চাই বাড়িটা শেষ অবধি ব্যাঙ্ক বিক্রি করতে পারেনি। ওটা এখনো ওই অবস্থাতে আছে। কেউ সেখানে যায় না—যেহেতু ভয় পায়, অন্ততঃ দীর্ঘ কুড়ি বছরের রেকর্ড তাই বলছে।

জুপিটার তাকালো ববের দিকে

বললে—তোমার রেকর্ড অনুসারে তাহলে এই দাঁড়ালো যে দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে ওই বাড়িতে কেউ একটা রাতও কাটাতে পারেনি—এই তো।

ঠিক তাই। অন্তত বিগত কয়েক বছরে যখন কোন খবর কাগজে প্রকাশ পায়নি, তখন তাই আমাদের অনুমান করে নিতে হবে। একটু থেমে বব আরো পরিষ্কার করে বললে: ভয়ঙ্কর দুর্গটি এখনও একইভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। ব্যাঙ্কও বিক্রি করতে পারেনি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো: লোকে বাড়িটা ভুতুড়ে বলেই ওর চারপাশে যেতে চায় না।

ঠিক আছে কেউ যেতে না চায়, আমরা যাব।

আর যাব আজই—

কথাটা বলে জুপিটার তাকালো ববের দিকে। মনে হয় তার যেন কিছু বক্তব্য আছে। সঙ্গীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে মনের কথা টের পেতে কোন অসুবিধে হলো না জুপিটারের।

সে বললে—এই ব্যাপারে আমাদের আর কোন দ্বিরোক্তি থাকতে পারে না। হাতে সময় কম, কাজটাও জরুরী। কাজেই আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজি নই। আজ রাত্রেই আমরা যাত্রা শুরু করবো। তবে আমাদের এই যাত্রা ঠিক অভিযান নয়। এটা হবে অনেকটা ফার্স্ট ভিজিটের মতো। কেবল দুর্গটার ভিতরে অস্বাভাবিক কিছু আছে কিনা দেখে আসা। আমার মনে হয় ভুতুড়ে বাড়িতে অলৌকিক কিছু খুঁজে বার করতে হলে রাতের দিকে যাওয়াটাই ভাল। কথা শেষে

জুপিটার তাকালো তার দুই সঙ্গীর দিকে। কারো মুখে কোন কথা নেই। তারপর ওদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে, আমরা ওই ভূতুড়ে ভয়ঙ্কর দুর্গে যাব ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডার নিয়ে। এর উদ্দেশ্য হলো অস্বাভাবিক কিছু দেখলে তার ছবি তুলে নেওয়া আর কোন কিছু শব্দ শোনা গেলে তা টেপে তুলে নেওয়া, এরপর শুরু হবে আমাদের সত্যিকার তদন্তের অভিযান।

জুপিটারের কথায় ওরা কেউ আপত্তি করতে পারলো না. চুপ করে থাকলো। আর তাদের মৌনতাই বুঝিয়ে দিল সম্মতির লক্ষণ।

ভয়ঙ্কর দুর্গের দিকে যাত্রার আগে জুপিটার শেষবারের মতো ববের লিখে আনা কাগজে জরুরী কিছু কথা পড়ে নিলো। বিষয়টা ভালভাবে জানা দরকার। বিশেষ করে পূর্বসূরীদের মতামত। বাড়িটার মধ্যে কে কোথায় কিঁ দেখেছে, কি অনুভূতি হয়েছে সব কিছু। কাগজে গোটা বিবরণটা ভালভাবে পড়ে নিয়ে বব এবার উঠে দাঁড়ালো। তারা তিনজনেই তৈরি। বব তার পকেটে একটা নোট বই আর গোটা কয়েক ভালভাবে কাটা পেনসিল নিলো, অভিযানের সময় এইগুলি খব দরকার। প্রয়োজন মতো কিছু লিখে নেওয়া যেতে পারে। তারপর কাঁধে ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে নিয়ে; ছোট টেপরেকর্ডারটা এগিয়ে দিলো পীটের হাতে। ববের কোমরের বেল্টের সঙ্গে একটা টর্চ লাগানো। অন্ধকারে কাজের সুবিধের জন্য সঙ্গে নেওয়া। পীটের সঙ্গেও একটা টর্চ।

এবার অন্ধকার হতে একে একে তিনজন বেরিয়ে এলো বাইরে। অন্ধকারে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো রোলস রয়েস। বব এগিয়ে গেল প্রথমে।

গাড়িতে উঠে বসে একটা রঙিন ম্যাপ চোখের সামনে মেলে ধরলো বব। ব্ল্যাক ক্যানিয়ানে যাওয়ার রাস্তাটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। ওয়ারিংটনও ম্যাপটা লক্ষ্য করলো।

বব একসময় মুখ তুলে তাকালো ওয়াদিটনের দিকে। বললে ম্যাপের ওপর পেনসিল ছুঁয়ে—আমাদের মনে হয় এই পথ ধরে যাওয়াটাই ঠিক হবে—তাই না।

ঠিক তাই।

তাহলে তাই চলো।

এবার গাড়িতে ভালভাবে উঠে বসলো সকলে। জুপিটার শেষ বারের মতো তার সাথীদের কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলো। বললে দুই সাথীর দিকে তাকিয়ে—আমাদের আজকের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হবে তথ্য সংগ্রহ করা, যাতে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আরো ভালভাবে কাজ করতে পারি। আর সেইজন্য আমাদের চারদিকে কড়া লক্ষ্য রাখতে হবে। অস্বাভাবিক কিছু দেখলে বা শুনলে তাকে ক্যামেরায় ও টেপ-রেকর্ডারে তুলে নিতে হবে পরীক্ষার জন্য। আমার কাজ হবে ছবি তোলা, কাজেই ক্যামেরা থাকবে আমার কাছে। আর পীট—তুমি কোন শব্দ শুনলেই তা তোমার টেপে তুলে নেবে। মনে রেখ ভয়ঙ্কর ওই দুর্গের মধ্যে আমরা দু'জনেই শুধু প্রবেশ করবো। ওয়াদিটনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে বব। তার কাজ হবে বাইরে থেকে আমাদের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করার পর আর কেউ তার মধ্যে প্রবেশ করছে কিনা সেদিকে নজর রাখা।

জুপিটারের কথায় ববের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। মুখে তার হাসি ফুটলো এতোক্ষণে। বললে বন্ধু জুপিটারের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাস্যময় গলায়—তোমাকে ধন্যবাদ জুপিটার, আমি ঠিক এই ধরনের কাজের প্রত্যাশাই করছিলাম। কিন্তু চারদিকে যা অন্ধকার

অন্ধকারেই তো ভূতুড়ে জায়গায় অভিযান করা উচিত। তাতে অনুসন্ধানের কাজ ভাল হয়।

পীট বা বব এবার কেউই উত্তর দিলো না। জুপিটার এবার তাকালো বাইরের দিকে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তাটা ক্রমান্বয়ে যেন সরু হয়ে যাচ্ছে। দু'ধারের পাহাড়গুলো একটু একটু করে মিশে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে। অন্ধকার ক্রমশ যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে। দেখা যাচ্ছে

না কিছু। সামনে আবার একটা বাঁক। খুব সরু হয়ে রাস্তাটা নিচে গেছে পাহাড়ের খাদের মধ্যে।

গাড়ির গতি কমালো ওয়াদিটন। বললে জুপিটারকে লক্ষ্য করে—গাড়ি নিয়ে আর বেশীদূর যাওয়াটা মনে হয় ঠিক হবে না। সামনের বাঁকটা পার হলেই মনে হয় আমাদের লক্ষ্য সেই গিরিখাদে আমরা পৌঁছতে পারবো—অন্ততঃ ম্যাপটা দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।

—তবে।

আমি গাড়ি এখানেই থামাচ্ছি। তোমরা নেমে পড়। এখান থেকে ওই গিরিখাদটা বড় জোর একশ গজের মধ্যে।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলো ওয়াদিটন। গাড়ি থামামাত্র গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো জুপিটার, ওর পিছনে পীট।

চারদিক ঘিরে সীমাহীন ঘন অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির হেডলাইটের আলো কিছুটা দূরে ছড়িয়ে পড়ে, মিলিয়ে গেছে। তারপর অসীম ঘন অন্ধকার। জুপিটার ও পীট এবার ভয়ঙ্কর দুর্গ অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। বব দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য করছিল অপলক চোখে দুই বন্ধুকে। একসময় পাহাড়ের একটা বাঁকের মধ্যে ওরা দুজনেই মিলিয়ে গেল।

অন্ধকারে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে এগিয়ে যাচ্ছিল দুজনে। জুপিটার আগে, ওর পিছনে পীট। অন্ধকারে তার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের টুকরোতে হোঁচট খাচ্ছে দুজনে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি বন্য লতাগুল্ম। অন্ধকার চিরে কানে ভাসছে একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ওদের কারো মুখে কোন কথা নেই।

একসময় ওদের চোখের ওপর ভয়ঙ্কর দুর্গটা ভেসে উঠলো। মাথার ওপর কালো আকাশকে পাহাড়ের শীর্ণ চূড়া বর্শার ফলায় গেঁথে দিয়েছে প্রথম কথা বললে পীট। আলতো গলায় জুপিটারকে বললে, দিনের বেলায় এখানে এলেই মনে হয় ভাল হতো। কিছুতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না যে কোথা দিয়ে হাঁটছি। পীট ভয় পেলেও জুপিটার কিন্তু তার সাহস

হারায়নি। বরং সহজ গলায় বললে, দিনের বেলায় এলে কিছুই হতো না। এইসব জায়গায় রাত্তিরের দিকেই আসতে হয়, তা না হলে গুপ্ত বস্তু উদ্ধার হবে কি করে।

কিন্তু রাতের দিকে যারা এসেছিল তাদের কথাতো শুনেছ, আমার কিন্তু বড় ভয় করছে।

আমারও যে করছে না তা নয়। তবু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তার চেয়ে বাপু বরং ফিরেই চলো না।

তা এখন আর হয় না। আমি এখানে একটা প্ল্যান নিয়েই এসেছি। আর এই প্ল্যানকে কার্যকরী করার জন্য আমাদের অন্তত এক ঘন্টা আজ এই দুর্গের ভিতরে থাকতে হবে।

জুপিটারের কথা মনে হয় পীটের খুব একটা মনপুতঃ হলো না। মনক্ষুন্ন হয়ে সে বললে, আমি যদি আগে জানতাম আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে এমন সব জটিল সাংঘাতিক কাজ করতে হবে তাহলে কিছুতেই আমি তোমাদের তদন্তকারী দলে নাম লেখাতাম না। যতসব বাজে ব্যাপার

পীটের কথাটা কানে আসতেই জুপিটার হাসলো। বললো, আমার কিন্তু দারুণ লাগছে। সত্যি আমাদের এজেন্সির প্রথম কাজটাই দেখছি দারুণ রোমাঞ্চকর হয়েছে, এতটা যে থ্রিলিং হবে ভাবিনি। পীট এবার চটে উঠলো আরো। বললো তীক্ষ্ণ গলায়, খুব তো বড় বড় কথা বলছ। ধর যদি সত্যি আমাদের কোন ভূতের সঙ্গে দেখা হয়।

আমি তো তাই চাই।

কথাটা বলে জুপিটার তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্যামেরাটা ঠিক করে নিতে নিতে বললে, তোমার কথা যদি ঠিক হয় পীট, তাহলে এক ভূতের ছবি তুলেই আমরা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যেতে পারবো।

আমার এখন বিখ্যাত হওয়ার প্রয়োজন নেই। পীটের কথাটা শেষ হতে পারলো না। মুহূর্তে তার হাতটা টেনে ধরলো জুপিটার। এক হেঁচকা টানে পীটকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আলতো গলায় থামিয়ে দিলো।

ইস্।

চকিত টানে থমকে গেল পাঁট।

ভয়ে নড়তে পারছিল না। দাঁড়িয়ে ছিল স্ট্যাচুর মতো।

চাপা স্বরে জুপিটার বললে, শুনতে পাচ্ছ কিছু···মনে হয় কেউ এদিকে আসছে।

এবার কান খাড়া করে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করলো পাঁট। সত্যি তো···কেউ একজন যেন আসছে? কে আসছে? কারা? অনেকে মিলে আসছে কি? নাকি একা কেউ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যে কুঁকড়ে গেল পাঁট। নিজেকে আড়াল করলো জুপিটারের পিছনে। বুকের ভিতরটা খসখস পাতার শব্দে অন্ধকারের মধ্যে শিরশির করছিল পাঁটের।

শব্দ যেন আরো স্পষ্ট হলো। হ্যাঁ মনে হয় কারো পায়ের শব্দ। তাদের দিকেই কেউ যেন আসছে। দ্রুত ক্যামেরাটা ঠিক করলো জুপিটার।

কাছাকাছি ঝোপটা নড়ে ওঠামাত্র সে ফ্ল্যাস গ্যান ক্যামেরার সাটারে আঙুল ছোয়ালো। দপ করে অন্ধকার চিরে জ্বলে উঠলো এক মুঠো আলো। আর সেই ঝলসানো আলোর মধ্যে পাঁট পরিষ্কার দেখতে পেলো এক জোড়া লাল চোখ তাদের দিকে নেচে নেচে ধেয়ে আসছে। আগুনের শিখার মতো ওই দুই চোখ দিয়ে যেন ফিনকি রক্ত ঝরছে।

চমকে উঠলো পাঁট।

ভয় পেয়ে দু'চোখ বন্ধ করলো। তার মনে হলো জ্বলন্ত তীব্র আগুনের মতো ওই তীক্ষ্ণ চোখ জোড়া যেন তাদের দৃষ্টি ধারালো ফলায় বিঁধে দেওয়ার জন্য ছুটে আসছে।

এক লহমা মাত্র। তারপর ওই আগুনের কুণ্ড উল্কাগতিতে ধেয়ে গেল পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে।

বন্য শশক।

শব্দটা উচ্চারণ করলো জুপিটার।

পাঁট-এর ধাতস্থ হতে সময় নিলো। তারপর বললে দম আটকানো ক্ষীন গলায়, আর একটু হলেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো।

তোমার কি তাই মনে হচ্ছে এখন।

হ্যাঁ।

আমার কিন্তু তা মনে হয়নি। একটু থেমে জুপিটার সামনের অন্ধকার গিরিখাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, আসলে এই অন্ধকারের মধ্যে ওই বন্য শশকের ধাবিত শব্দে গোটা পরিবেশকে ভয়ার্ত করে তুলেছিল বলতে পারি। একটু হেসে জুপিটার তার কাঁধের ক্যামেরাটা ঠিক করে নিতে নিতে বললে, চলো আর একটু এগুলেই আমরা ভয়ঙ্কর দুর্গের কাছে পৌঁছে যাব। তবে পীট খুব সাবধান কিন্তু, আমরা ভূতেদের আসল আড্ডায় এসে পড়েছি। মনে আছে তো নীল মায়াবী মূর্তিটার কথা।

জুপিটার অদ্ভুত সিরিয়াসভাবে কথাটা বললো পীটের উদ্দেশ্যে। পীট এবার আরো যেন ভয় পেলো। বললে, তোমার কি সত্যি সত্যি মনে হয় ওখানে কোন নীল রঙের অলিক মূর্তি আছে।

থাকলেও থাকতে পারে। এর আগে যারা এখানে এসেছেন তারা যখন দেখেছে তাকে। তবে আমার ক্যামেরা তৈরি আছে, আমি তাকে দেখতে পেলেই ছবি তুলে নেব।

পীট উত্তর দিলো না সে কথার। কেবল বললে, আচ্ছা জুপ, আমি যদি সা-রে-গা-মা করে গান করি তাহলে মনে হয় আমরা কোন বাজে শব্দ শুনতে পাব না তাই না।

তাতে লাভ কি হবে। আমরা ভূত তারাতে তো এখানে আসিনি, আমরা এসেছি ভূত সত্যি আছে কিনা পরীক্ষা করতে। বরং তার চেয়ে মুখ বুজে চলো, দেখ না কিছু দেখতে বা শুনতে পাও কিনা। আর তা ছাড়া তোমাকে তো দেখার দায়িত্ব দিইনি, দিয়েছি শোনার দায়িত্ব, সেইজন্য তো টেপটা তোমার কাঁধে দিয়েছি।

পীট আর কথা বাড়ালো না। জুপিটারকে অনুসরণ করে হাঁটতে লাগলো নিঃশব্দে।

একসময় জুপিটার নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললে, আমরা এসে গেছি।

জুপিটারের কথায় পীট তাকালো।

সামনেই দুর্গের বড় চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। একটু লম্বা চূড়াটা যেন

আকাশ ভেদ করে গেছে। তার পাশে আর একটা ছোট চূড়া। বাইরে থেকে অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল দুর্গের জানলাগুলো খোলা। কোন কাঠের পাল্লা নেই। দূর থেকে জানলাগুলোকে দেখে মানুষের খেবলানো চোখের মতো লাগছিল।

জুপিটার এগিয়ে গেল। ওর পিছনে পীট। অন্ধকার দুর্গের দিকে পা বাড়ানো মাত্র দু'জনেই থমকে গেল। প্রচণ্ড ধাবিত শব্দে মনে হলো তাদের মাথার খুব কাছ ঘেঁসে কি যেন একটা উড়ে গেল।

ভয়ে কয়েকটা পা পিছিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বললে—বাদুড়।

আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে ভয় নেই বাদুড় কাটনাশক, মানুষের কোন ক্ষতি করে না। বরং ভয় পায় বলতে পার।

জুপিটারের কথাটা পীটের অনেকটা ছোটদের কাছে জ্ঞান দেওয়ার মতো বলে মনে হলো। তাই মৃদু হেসে নিজের মনের ভয়ের ভাবটা দূর করে বললে, আমি তা জানি বাদুড় মানুষের মাংস খায় না। তবে এখানকার বাদুড় তো, কে জানি তবে তার মতিগতি ভিন্ন হতেও পারে।

জুপিটার মনে মনে হাসলেও সে কোন উত্তর দিলো না। তার লক্ষ্য ছিল তখন অন্য দিকে। সে দেখতে পাচ্ছিলো তারা ভয়ংকর দুর্গের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দরজার কাছে পৌঁছে জুপিটার এবার বললে—আমরা এবার কিন্তু ভিতরে ঢুকবো পীট। আমাদের জন্য খোলা দরজাটা অপেক্ষা করছে।

আমার মনে হয় আগে ভাগে ভিতরে না ঢুকে, আগে বরং একটা পা দিয়ে দেখ জায়গাটা ঠিক কিনা।

আমার পা জোড়াকে আমার খুব বিশ্বাস। মনের সাড়া পেলেই সে তার কাজ করতে অভ্যস্ত। অতএব—

কথা শেষ না করেই জুপিটার অন্ধকারের ভিতরে প্রবেশ করলো।

চারদিকে বড় বড় পাথরের দেয়াল। গোটা মেঝেটাও পাথরের তৈরি তা পা দিয়েই বুঝতে পেরেছিল তারা। এবার তারা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

ছোট একটা দরজা।

মনে হয় দরজাটা খুললে কোন একটা ঘরে তারা প্রবেশ করতে পারবে। জুপিটার টর্চের আলো ফেলে দরজাটা লক্ষ্য করছিল। না— দরজায় কোন চাবি দেওয়া নেই। এবার টর্চ নিভিয়ে জুপিটার দরজাটা ঠেলে খোলার জন্য ব্যস্ত হলো। তার আগেই তাকে বাধা দিলো পীট।

দাঁড়াও

জুপিটার ঘুরে তাকালো পীটের দিকে।

কিছু শুনতে পাচ্ছ।

পীটের কথা মতো জুপিটার কিছু একটা শোনার জন্য কান খাড়া করলো। অস্পষ্ট সুর মূর্চ্ছনা। মনে হলো দূরে কোথাও অরগ্যান বাজছে। সেই শব্দ ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিহত সুর মূর্চ্ছনার শব্দকে তাই যেন অস্পষ্ট শুনাতে লাগছে। রাতের অন্ধকারে সেই সুর মূর্চ্ছনা অদ্ভুত একটা পরিবেশের সৃষ্টি করতে চাইছে যেন। খুব মন দিয়ে সুর মূর্চ্ছনার শব্দ শোনার চেষ্টা করলো জুপিটার। পীটের গলা শুকিয়ে আসছিল। তার মনে হচ্ছিলো এই অস্পষ্ট সুর মূর্চ্ছনার শব্দ তার শরীরে মিশে যাচ্ছে রক্ত স্রোতের সঙ্গে—আবেশে ডুবিয়ে দিতে চাইছে তাকে।

এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে জুপিটার বললো—মনে হয় গোটা ব্যাপারটাই আমাদের মনের কল্পনা।

কল্পনা।

মুহূর্তে জুপিটার আবার কি যেন ভাবলো। তারপর খুব সহজ গলায় বললে—ও কিছু নয়। আসলে মনে হয় উঁচু পাহাড়ের আড়ালে অন্য কোন গিরিখাদ আছে। সেখানে কেউ টি. ভি. সেট চালিয়েছে—এটা তারি শব্দ। সেই জন্যই শব্দটা এত অস্পষ্ট শোনাচ্ছে আমাদের কাছে। একটু থেমে জুপিটার বললে, গোটা ব্যাপারটার জন্যই মনে হয় কারো চালাকি আছে।

চালাকি—কি বলছ তুমি, তাহলে ওই অলীক মূর্তি সেটাও কি তুমি কারো চালাকি বলতে চাও!

দেখাই যাক, পরীক্ষা করার জন্য যখন এসেছি, তখন সব কিছু আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এখন বরং এসো সময় নষ্ট না করে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়ি।

জুপিটার এবার দরজা ঠেললো।

ক্যাচ-ক্যাচ শব্দে খুলে যাচ্ছিলো দরজাটা। নৈশব্দময় অন্ধকারে এই শব্দ পীটকে বিদ্ধ করছিল যেন। তার গরম চামড়া ভেদ করে অদ্ভুত অনুভূতির শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছিল রক্তের মধ্যে। হিম হয়ে আসছিল ওর শরীর।

অন্ধকারে ওরা দু'জনে ভিতরে প্রবেশ করলো এবার জুপিটার এগিয়ে যাচ্ছিল আগে আগে, ওর ঠিক পিছনে পীট। দু'জনে সতর্ক। ওরা একটা হলঘরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল। এক সময় দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখতে পেল দু' ধারের দেয়াল ফুঁড়ে অসংখ্য ছায়ামূর্তি যেন ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। পীট কিছু বলার আগেই জুপিটার তার হাতের টর্চটা জ্বালালো। কিছুটা ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়লো সামনের অন্ধকার চিরে। আর সেই আলোয় তারা দেখতে পেল দেয়ালের গায়ে ঝুলছে অসংখ্য ছবি। ছবিগুলো মোটা-মোটা তার দিয়ে ঝোলানো। সার সার দেখা যাচ্ছে তারগুলোকে। যা তারা অন্ধকারে খানিক আগে ছায়ামূর্তি বলে মনে করেছিল।

জুপিটার বললে পীটের দিকে তাকিয়ে—এই সেই হলঘর। এই হলঘরটাই হলো দুর্গের একটা লক্ষ্যনীয় বিষয়। একটু থেমে পীটকে খানিকটা কাছে টেনে নিয়ে জুপিটার বললে আলতো গলায়—এইখানেই আজ আমরা এক ঘন্টা থাকবো।

এখানে থাকবে ?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে পীট। তার প্রশ্ন শেষ হতে পারলো না— হলঘর কাঁপিয়ে কে যেন বললে এখানে থাকবে ? চমকে উঠলো পীট।

কে কথা বললে—কেউ কি ?

কিছু শুনতে পেয়েছ ?

ফিস-ফিস স্বরে কথাটা বললে পীট জুপিটারকে। জুপিটার উত্তর

দিলো না। পীট আবার তাকে বললে ঠাণ্ডা নিচু গলায়—আমার মনে হয় এখানকার দৈত্যটা আমাদের সাবধান করে দিতে চাইছে। আর এখানে অপেক্ষা করাটা ঠিক হবে না জুপ। চলো আমরা চলে যাই।

কথাটা শেষ করেই পীট পা বাড়াচ্ছিল দরজার দিকে। জুপিটার পিছন থেকে তার হাত টেনে ধরে বললে দৃঢ় গলায়—যাচ্ছ কোথায়, দাঁড়াও।

শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়েই বললে জুপিটার। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ঠিক আগের মতো কে যেন ধমক দিয়ে অন্ধকার চিরে তাদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো—দাঁড়াও।

শব্দটা মিলিয়ে গেল।

আবার নীরবতা। পীট ততোক্ষণে ঘেমে উঠেছে। শক্ত করে নিজের মুঠোর মধ্যে ধরেছে জুপিটারের একটা হাত। পীটের দিকে তাকিয়ে জুপিটার বললে—ঠিক এইরকম হবে আমি অনুমান করেছিলাম। একটু থেমে সে পীটকে বললে—যা শুনলে, তা আসলে প্রতিধ্বনি। এবার জুপিটার পীটকে ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য হলঘরের দেয়ালগুলো দেখিয়ে বললে—ভাল করে তাকিয়ে দেখ তো। কি দেখছ?

পীট লক্ষ্য করলো।

জুপিটার বললে, এই হলঘরের দেয়ালগুলো দেখছো না কত উঁচুতে আর কি রকম গোল হয়ে আছে। এই ধরনের গোলাকৃতি উঁচু দেয়াল হলেই প্রতিধ্বনি স্পষ্ট হয়। আমার ধারণায় ব্যাপারটা জেনেশুনেই বাড়ির মালিক মিষ্টার স্টিপেন টেরিল এটা নির্মাণ করেছেন। একটু থেমে জুপিটার তার কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললে, এই কারণেই এই হলঘরটাকে তাই এক সময় 'ইকো রুম' বলা হতো। বুঝেছ—

ইকো রুম।

ইকো ডুম।

খান খান হয়ে এবার ঘরময় ছড়িয়ে গেল শব্দটা।

নিজের মনে শব্দটা শুনে চমকে উঠলো পীট—ইকো ডুম।

রুম না ভুম, কি শুনলো সে? কি বললো জুপিটার, রুমই তো, তাহলে তাকে সংশোধন করে ভুম বললো কে? নাকি সে ভুল শুনেছে?

হয়ত···মনে মনে সাহস আনার চেষ্টা করলো পাঁট।

কি ভাবছ?

কিছু না। একটু হেসে পাঁট বললে কণ্ঠস্বরে মৃদু হাসি নিয়ে, তুমি দেখছি খুব সিরিয়াস একটু ইয়ার্কি বোঝনা। তোমার সঙ্গে একটু খেলা করছিলাম দেখে তুমি ভাবলে আমি ইকো ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারিনি। তো—এটা না বোঝার কি আছে, খুব সাধারণ ব্যাপার। সবাই জানে। কথাটা বলেই সে প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলো।

হো-হো-হি-হি-হো-হো—

পাঁটের হাসি থামলো।

শুরু হলো প্রতিধ্বনি।

হে-হে-হি-হি-হো-হো।

আতঙ্কিত এই প্রতিধ্বনির মধ্যে দিয়ে পাঁট মনে মনে বুঝে নিলো খানিক আগে সে যা শুনেছে তা ভুল। ওটা ভুম নয় রুমই হবে। ব্যাপারটা এতক্ষণে তার সহজ হলো। তারপর বললে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে, কি হে বলো না আবার এইরকম করবো।

কি লাভ হবে। ওতে কেবল নিজেই নিজের কথা শোনা সার হবে, সে সময় আমাদের হাতে নেই পাঁট। অনেক কাজ বাকি।

এবার পাঁট সহজভাবে বললে, এই ইকো রুমের কথা তো তুমি আমায় আগে বলোনি।

বলবো আবার কি, কেন তুমি খবের রিপোর্টটা যখন পড়া হচ্ছিল তখন শোননি। ওই রিপোর্টের মধ্যে তো ইকো রুমের কথা বলা ছিল।

তা থাকতে পারে, আমি ঠিক শুনিনি। আসলে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

কেন?

আমি সেই ইষ্ট পরিবারের কথা ভাবছিলাম, যারা পাঁচজন রাত্রিবাস করতে এসে আর ফিরে যেতে পারেনি। জুপিটার এবার পাঁটের কথার

সত্যাংগা প্রকাশ করে বলল, আশ্চর্য। তুমি যাদের কথা ভাবছ তারা হয়ত এতদিনে তাদের দেশে নিশ্চিন্তে পৌঁছে গেছে। যাই হোক শোন আমরা এখানে অন্য কারো খোঁজে আসিনি. আমরা এসেছি এখানকার প্রতিভাবান নীল মায়াবী মূর্তিকে আবিষ্কার করতে, যাকে তুমি প্রতিভাধর অভিনেতা মিষ্টার স্টিপেন টেরিলের আত্মাও বলতে পার। আমাদের উদ্দেশ্য তাকেই খুঁজে বার করা।

কথাটা বলে জুপিটার এবার বললে আদেশের সুরে, চলো এখানে দাঁড়িয়ে আর কোন লাভ নেই। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে বারবার প্রতিধ্বনি হবে, যা আমাদের কাজকে এগুতে দেবে না।

জুপিটার এগিয়ে গেল সামনের দিকে। পীট অনুসরণ করলো।

টর্চের আলোয় তারা পরীক্ষা করছিল ছবিগুলো। ছবিগুলো একই মানুষের। দেখে মনে হয় একজন লোককে বিভিন্ন রূপসজ্জায় সজ্জিত করে ছবিগুলো তোলা। আর সেই লোকটি যে স্বয়ং এই দুর্গের মালিক মিষ্টার স্টিপেন তা বুঝতে অসুবিধা হলো না তাদের। দেয়ালের ছবিতে কোনটায় তাকে দেখা যাচ্ছে দৈত্যের পোশাকে, বা নেকড়ের পোশাকে আবার জলদস্যুর চেহারায়। ছবির সঙ্গে দেয়াল ঘিরে ঝোলানো আছে বিভিন্ন পোশাক! পোশাকগুলো বিভিন্ন রঙের শুধু নয়, বিচিত্র ধরণেরও বটে। হঠাৎ তারি মধ্যে জুপিটার শুনতে পেল পীটের কণ্ঠস্বর। সে যেন খুব ভয় পেয়েছে।

কি ব্যাপার পীট।

একটা চোখ।

কোথায়?

ওই এক চোখ জলদস্যু ছবিটার কথা বলছি। তুমি দেখছ?

হ্যাঁ কেন দেখবো না।

একটা চোখ।

হ্যাঁ অন্য চোখটা রঙ দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তা ঠিক, তবে ছবিটার মধ্যে যে চোখটা আছে দেখছো।

হ্যাঁ তৈলচিত্রের নিখুঁত শিল্পচাতুর্য।

কিন্তু—

কিন্তু কিসের আবার।

আমাদের দেখছে।

কে?

ওই চোখটা। তাকিয়ে দেখ কিভাবে তাকিয়ে আছে। কি অসম্ভব জ্বলছে চোখটা—বাঘের মতো। নীলচে আলো যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

জুপিটার হেসে বললে—ওটা তোমার কল্পনা।

কি বলছ কল্পনা। মোটেই না। অন্য ছবিগুলোর কথা জানি না, তবে এই ছবির চোখটা একেবারে জীবন্ত—সত্যিকারের চোখ বসানো। দেখছ না কি অত্যন্ত তীব্রতা নিয়ে চোখটা জ্বলছে। আমাদের লক্ষ্য করছে।

জুপিটার একবার এগিয়ে এলো ছবিটার কাছে।

বললে—কোথায় তোমার জীবন্ত চোখ দেখি।

দেখই না নিজে আমি ঠিক বলছি কি না। সত্যিকারের একটা বাঘের চোখ যেন বসানো আছে ছবিটার মধ্যে। কি অসম্ভব তীব্র—জুপ।

টর্চের আলোয় দেখলো জুপিটার। পীট স্থির চোখের দৃষ্টি মেলে রেখেছিল ছবির ওই চোখটার দিকে। জুপিটারও লক্ষ্য করলো। ছবির চোখে আলো পড়তে স্বস্তি পেল পীট। না—তার অনুমান ভুল। জুপিটার ঠিকই বলেছে। চোখটা সত্যিকারের চোখ নয়, আঁকা। আঁকা তবে কি নিখুঁত জীবন্ত। জ্যান্ত চোখের একটা চোখ বললেও ভুল হয় না। জুপিটার কোন কথা না বলে তাকালো তার দিকে। লজ্জিত হয়ে পীট বললে, সত্যি বড় ভুল হয়ে গেছে আমার। আমি বুঝেছিলাম ঠিক—তবু বিশ্বাস হচ্ছিল না। আশ্চর্যরকম ভাবে চোখটা জ্বলছিল। তারপর একটু থেমে বললে পীট—তুমি কি হাত দিয়ে কিছু অনুভব করেছ?

করেছি। অসম্ভব ঠাণ্ডা।

ঠিক বলেছ। ঠিক মরা মানুষের মতো।

কথাটা বলে পীট এবার চারপাশে তাকালো। তারপর ফিসফিস স্বরে বললে, তুমি কি কিছু টের পাচ্ছ জুপ।

—হ্যাঁ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমরা যেন মেরুর কোন প্রান্তিক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। শীত করছে।

আমারো। ঠিক বরফের মধ্যে থাকলে যেমন লাগে তেমনি।

সত্যি ভাই—তারা তখন অসম্ভব ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে কাঁপতে শুরু করেছিল যেন। এত ঠাণ্ডা—দাঁতে দাঁত লেগে আসছে। একসময় তারা অনুভব করলো তাদের শরীরের মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো যেন বরফের চূর্ণ ঝরে পড়ছে। বাতাসে ক্রমান্বয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। জমে আসছে অন্ধকার।

অদ্ভুত এক অনুভূতির মধ্যে দাঁড়িয়ে পাঁটের ঠিক বুকের ভিতরটা যেন হিম হয়ে গেল। তার মনে হলো শরীরের রক্ত যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে। অস্ফুট স্বরে বললে পাঁট।

জুপ কিছু টের পাচ্ছ।

হ্যাঁ। একটা হাতের স্পর্শ। ঠিক আমার কাঁধের ওপর। আমাকে ছুঁয়ে আছে।

তবে কি সেই মায়াবী মূর্তি।

জানি না। তবে আমি ওর স্পর্শ টের পাচ্ছি।

তাহলে—

তোমার পা জোড়াকে শক্ত কর।

কেন আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু এখনই আমাকে এখান থেকে ছুটে পালাতে হবে।

কথাটা বলে জুপিটার আর দাঁড়ালো না। ছুটে গেল। ওর পিছনে পাঁট। তার মনে হচ্ছে পিছন থেকে কেউ যেন তাকে ধরার জন্য ছুটে আসছে। বিশাল একটা লম্বা লোমশ হাত যেন ছুঁতে চাইছে তাকে। কি অসম্ভব এই ঠাণ্ডা স্পর্শ—শির শির করে ওঠে পাঁটের শরীর। জুপিটারকে সে চোখের ওপর দেখতে পায় না—সামনে বিশাল শূন্যতা।

এক ঘণ্টার আগেই ওরা আবার ফিরে এলো নিজেদের আস্তানায়। বব জুপিটারের নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করার আগে দেখতে পেলো ববের

কাকা-কাকীমাকে। তারা লোক দিয়ে একটা মাঝারি ধরনের পাইপ-অরগ্যান মাটিতে বসাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা মন দিয়ে লক্ষ্য করতে পারলো না বব—তার আগেই জুপিটার তাকে ভিতরে আসতে বললো। বব ভিতরে ঢুকে বসলো নিজের চেয়ারে। পীট ও জুপিটার দু'জনের মুখের চেহারা তখন বেশ বিবর্ণ। বব তাদের লক্ষ্য করলো। ফেরার পথে গাড়িতে ওদের বহুবার প্রশ্ন করেছিল বব—ওরা কেউ কোন উত্তর দেয়নি; হাঁপাচ্ছিল। তাদের মুখ ও চোখের চেহারায় বোঝা যাচ্ছিল তারা যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। ভয়ের সেই ভাবটা যে এখনো তাদের পুরোপুরি কাটেনি তা বুঝতে অসুবিধে হলো না ববের। তবু সে প্রশ্ন করলো আমায়—কি ব্যাপার বলতো। কি হলো তোমাদের। ভয়ঙ্কর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে তোমরা কি সেই নীল মায়াবী মূর্তিকে দেখতে পেয়েছ?

জুপিটার তাকালো। এতক্ষণে সে সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে পীটের দিকে তাকিয়ে—সব বলছি। তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটা মুখে বলার চাইতেও তুমি কানে শুনলে ভাল বুঝতে পারবে। কথাটা বলে জুপিটার পীট'এর দিকে তাকিয়ে বললে—কি আশা করি তুমি নিজেই তোমার টেপে ওই ভুতুড়ে শব্দগুলো তুলে নিয়েছ। বাজাও তো শুনি একবার।

জুপিটারের কথায় সে অবাক হলো। তারপর বললে, বিস্ফারিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে—বারে আমি টেপে কাজ করবো কি করে—দেখলে তো কি করে ছুটে পালাতে হলো।

চমৎকার। তাহলে তোমার টেপে কোন কাজ হয়নি।

না।

জুপিটার এবার তাকালো তার দিকে। তারপর নরম গলায় বললে, যাক, এ ব্যাপারে তোমাকে কোন দোষারোপ করবো না। তবে এখন থেকে আমাদের সকলকে নিজেদের কাজ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। পীট উত্তর দিলো না। মনে হলো সে যেন তখন অলৌকিক পরিবেশকে নিজের মনে উপলব্ধি করে চলেছে।

জুপিটার তার ড্রয়ার থেকে একটা বড় কাগজ আর পেনসিল বার করে বললে, শোন, এখন আমাদের কাজ হলো আত্মবিশ্লেষণ করা। মানে আমরা ভয়ঙ্কর দুর্গের মধ্যে কে কি দেখেছি, সেই বিষয় আলোচনা করা।

কথাটা বলে জুপিটার কাগজের ওপর দ্রুত হাতে কি যেন লিখলো তারপর বললে পীটের দিকে তাকিয়ে, আমরা ওখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি তাই না পীট?

ঠিক তাই।

কিন্তু কেন? কেন তুমি পালালে পীট?

বারে আমি একা পালিয়েছি নাকি, তুমিও তো পালিয়েছিলে।

আঃ, তা আমিও জানি! কথাটা তা নয়, এটা আমাদের তদন্তের প্রশ্ন, এর উত্তর আমিও দেব। এখন যা বলছি তাই বলো।

ব্যাপারটা এবার যেন বোধগম্য হলো পীটের। নিজেকে সহজ করে নিয়ে সে বলতে আরম্ভ করলো।

যদি আমার পালানোর কারণ জানতে চাও তো বলি, 'ইকো রুমে' প্রবেশ করেই খুব ভয় পেতে শুরু করি আমি। আমার পা জোড়া কাঁপতে থাকে। ঘামতে থাকি। এরপর অদ্ভুত একটা আতঙ্কভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে তোলে, আমি ভীষণ ভয় পাই, এর ফলে আমি আর দাঁড়াতে না পেরে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসি।

দ্যাটস রাইট পীট। আমার বক্তব্যও ঠিক তোমারই মতো। আমি অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিলাম। এরপর আমি যখন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বরফের চূর্ণ গায়ে পড়তে দেখলাম, ঠিক তখনই, জুপিটারের কথা শেষ হলো না, তার আগেই পীট বললে, সেই চোখ-জোড়া, যেটা আমার দিকে জীবন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল তার কথা বলো।

বলছি, ওটা আসলে আমাদের দুর্বল ভয়ার্ত মনের একটা কল্পনা। আসলে কি জান, আমরা ওই দুর্গে কেউ কিছুই দেখতে পাইনি, কেবল অযথা মনগড়া স্নায়ু দুর্বলতায় ভয় পেয়েছি। তাই আমার কথা হলো, ওই দুর্গে আবার আমাদের আর একবার যেতে হবে।

আবার!

পীট বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে কথা ছুঁড়ে দিলো জুপিটারকে। সেও যেন কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল তার আগেই জুপিটার শুনতে পেলো তার ঘরের ফোনটা বেজে উঠেছে।

ফোনটা বাজতে দেখে অবাক হলো সে। অবাক হওয়ারই কথা, কারণ তার এই ফোনের কথা এখনো কেউ জানে না যে ফোন করতে পারে। দিন কয়েক মাত্র এসেছে ফোনটা তার ঘরে। নতুন টেলিফোন বইতে এখনো তার নাম ওঠেনি। সেই কারণেই সে অবাক হলো। প্রথমটা ভাবলো হয়তো তার ভুল হচ্ছে, তার ফোনের শব্দ হয়তো এটা নয়। পাশের ঘরে তার কাকাকে হয়তো কেউ চাইছে। কিন্তু এ কি! এবার স্পষ্ট ফোন বাজার ক্রিং-ক্রিং শব্দ তার কানে এলো। পীট ও বব দু'জনেই তাকালো তার দিকে। জুপিটার হাতের ইশারায় তাদের উঠতে বারণ করে নিজেই এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। টেলিফোনের পাশেই পড়ে আছে একটা বড় ভাঙ্গা চোরা রেডিও। মাইক্রোফোন আর স্পিকার। রিসিভারটা এক হাতে তুলতে তুলতে মাইক্রোফোনের স্পিকারটা টেলিফোনের মাউথপিসের সামনে অন্য হাতে ধরলো জুপিটার। এর ফলে রেডিও'র মধ্যে দিয়ে শোনা গেল বেশ জোরালো গলায় জুপিটারের কণ্ঠস্বর।

হ্যালো।

বব ও পীট অবাক হয়ে ঝুঁকে পড়লো সেদিকে। রেডিওর মধ্যে দিয়ে টেলিফোনের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো তারা।

জুপিটার আবার বললে, হ্যালো···হ্যালো।

কোন উত্তর নেই।

হ্যালো।

টেলিফোন নিরুত্তর।

এবার রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো জুপিটার। বললে, মনে হয় ভুল নাম্বারে কেউ ফোন করেছে, আমাদের নয়! যখনই আমি কথা বলছি তখনই—

কথাটা শেষ হলো না, টেলিফোন আবার বাজলো।

এবার জুপিটার দ্রুত হাতে ফোন তুলেই বিরক্ত মাখা গলায় বললে, কে? হ্যালো।

খানিক নীরবতা।

তারপর রেডিও মারফত একটা গমগমে শব্দ ছড়িয়ে গেল ঘরের মধ্যে। জুপিটার!

কে আপনি? আমি জুপিটার জোন্স কথা বলছি।

এবার কণ্ঠস্বর আরো ভারি হলো। শব্দ জোরালো হলো।

ছড়িয়ে গেল ঘরের চারদিকে। থেমে থেমে, কাটা কাটা ভাবে অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এলো অদ্ভুত ভারি কণ্ঠস্বর···

ভু—ল—ক—র—ছো।

কিসের ভুল?

বি—র—ত—থা—ক!

বিরত থাক, কিসের থেকে। হ্যালো-হ্যালো।

আর কোন কিছু শোনা গেল না।

ঘরের মধ্যে মুহূর্তে নেমে এলো অন্ধকার. জুপিটার টেলিফোন রেখে ফিরে এলো তার জায়গায়। সে কিছু বলার আগে পীট নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে এখুনি একবার বাড়ি যেতে হবে জুপ. খুব জরুরী একটা দরকার আছে মার সঙ্গে।

কিন্তু তোমার রাতের খাবার তৈরি আছে। কাকীমাকে বলে রেখেছি তোমাদের খাওয়ার কথা।

আজ নয়। আমি চলি।

পীট বেরুতে পারলো না, তার পিছন পিছন বব্ও উঠে পড়লো। জুপিটার কোন বাধা দিলো না। ওরা চলে গেলে মনে মনে হাসলো সে। বুঝতে পারলো, টেলিফোনের কথাটা ওরা বুঝতে পেরেছে। কেউ একজন তাদের নিষেধ করছে, তারা যেন ভয়ঙ্কর দুর্গে অভিযান থেকে বিরত থাকে এই ব্যাপারটা। কিন্তু টেলিফোন তাদের করলো কে? সে কি তবে ওই ভয়ঙ্কর দুর্গের কোন অভিশপ্ত আত্মা, নাকি অন্য কেউ?

সত্যি কি তবে এটা কোন ভুতুড়ে ফোন?

জুপিটার ভাবতে থাকে।

ততোক্ষণে ওর দুই সঙ্গী পার হয়ে গেছে তাদের স্যালভেজ ইয়ার্ড এলাকা।

জুপিটার উঠে দাঁড়ায়। মনের মধ্যে তার একটাই চিন্তা যে করেই হোক, এই ভূতুড়ে ফোনের রহস্য তাকে ভেদ করতে হবে।

তিন গোয়েন্দা মুখোমুখি। তারা মনে হয় খুব একটা জরুরী বিষয় নিয়ে নিজেরা আলোচনা করছিল। প্রথম কথা শোনা গেল জুপিটারের। সে সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললে—এখন আমাদের সামনে মূলতঃ দুটি সমস্যা প্রধান।

আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে মিঃ হিচককের সঙ্গে আমাদের কথা বলাটা ভাল।

কোন দরকার নেই। আমাদের সমস্যা আমাদেরই সমাধান করতে হবে। আর তাই উচিত।

তাহলে বলো কিভাবে সমাধান করতে চাও?

পীটের প্রশ্নের উত্তরে জুপিটার এবার বললে—আমাদের প্রথম জানা দরকার টেলিফোনটা কে করেছিল।

কে আবার, মনে হয় ওই ভয়ঙ্কর দুর্গের সেই অভিশপ্ত আত্মার কথা।

বাজে কথা। অভিশপ্ত আত্মারা কখনও মানুষের মতো গলায় কথা বলতে পারে না। টেলিফোন যেই করুক, তা করেছিল একজন জীবিত লোক—

কিসের জন্য তোমার এই ধারণা?

নিশ্চয়ই এই দুর্গের সঙ্গে তার কোন স্বার্থ আছে। তাকে তুমি সাজানো ভাবনায় আত্মাও বলতে চাইছ।

মানে! একটু পরিষ্কার করে বলো।

এই মুহূর্তে এর চাইতে বেশী পরিষ্কার করে কিছু বলা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি আমার নাম্বারে টেলিফোন কোন ভূতে করেনি,

করেছে খুব পরিচিত কেউ একজন। তাকেই প্রথম খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। আর দ্বিতীয় কাজ হলো মিঃ স্টিপেন টেরিলের বিষয় খোঁজ নেওয়া।

কি করে পাবে তার খোঁজ, তিনি তো মৃত।

তার কোন বন্ধুর কাছ থেকে। নিশ্চয়ই সে রকম লোক দু-একজন হলিউডে বেঁচে আছেন এখনো।

যেমন ?

যেমন ধর তাদের মধ্যে 'উ্যইস প্যারার' হলো একজন।

'উ্যইস প্যারার'। সে আবার কে ? ভারি অদ্ভুত নাম তো ?

পীটের প্রশ্নে জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে বললে—ওটা ওর আসলে ছদ্মনাম।

আসল নাম হলো মিঃ জোনাথন রেক্স। ভদ্রলোকের সঙ্গে স্টিপেনের বন্ধুত্ব অনেক দিনের। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। আমাদের তার কাছে যেতে হবে। কথাটা বলে পকেট থেকে একটা পেপার কাটিং বার করলো জুপিটার। এটা ববের সংগ্রহ। পুরনো কাগজ থেকে সে সংগ্রহ করেছে ছবিটা।

ওরা ঝুঁকে পড়লো ছবিটার ওপর।

পাশাপাশি দুটো মানুষকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে। একজনের মাথায় টাক, লম্বা ধরনের চেহারা। সামান্য নীচু হয়ে তিনি একজন বেঁটে খাটো লোকের সঙ্গে করমর্দন করছেন। জুপিটার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই বেঁটে ধরনের সাধারণ চেহারার বাদামী চুলের মানুষটাই হলেন স্টিপেন টেরিল। অন্যজনের নাম মিঃ রেক্স। লোকে বলে স্টিপেন, তার এই ছোট্ট চেহারাকে নাকি ইচ্ছামত বাড়াতে কমাতে পারতেন। মায় কি কণ্ঠস্বরও। এই একই স্বভাব তার বন্ধুর মধ্যেও ছিল। আর ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছো তাদের মধ্যে কতটা সখ্যতা ছিল।

পীট এবার বললে—তা না হয় বুঝলাম! কিন্তু ওকে পাবে কোথায় ?

টেলিফোন গাইড থেকে ওর নাম ঠিকানা আমি তুলে রেখেছি।

তা হলে একবার টেলিফোন করেই দেখ না।

না। আমরা নিজেরাই যাব। লোকটাকে একবার চোখে দেখারও দরকার আছে। তা ছাড়া সব কাজ তো আর টেলিফোনে সারা যায় না। আর আমিও চাই না, আমাদের টেলিফোনের কথাটা কেউ জানুক।

তাহলে কি করবে?

কি আবার—আমি ওয়াদিটনকে খবর পাঠিয়েছি।

গাড়ি নিয়ে সে তৈরি। আমাদের যেতে হবে ৯১৫ নম্বর উইনডিং ভ্যালি রোডে।

দারুণ পরিকল্পনা।

বব সমর্থন করলো। বন্ধুর সমর্থন পেয়ে উঠে দাঁড়ালো জুপিটার। বললে—তাহলে চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।

তাই চলো।

বাইরে বেরিয়ে এলো তিনজন গোয়েন্দা। গেটের বাইরে সোনা-মোড়া রোলস রয়েস নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওয়াদিটন। ওরা কাছে এসে দাঁড়াতেই গাড়ির দরজা খুলে দিলো।

কোথায় যেতে হবে বস।

জুপিটার ববকে বিদায় দিয়ে পীটকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে জায়গাটা বুঝিয়ে দিলো ওয়াদিটনকে। পাহাড়ি গিরিখাদের সর্পিল পথ দিয়ে গাড়ি চালাতে ওয়াদিটন অভ্যস্ত। পাহাড়ি সব রাস্তাই তার চেনা। কাজেই সে উইনডিং ভ্যালির দিকে গাড়ি ছোটালো।

খাড়াই পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ছুটে যাচ্ছিল গাড়ি। আঁকা-বাঁকা সরু পথ। কখনও ওপরে উঠছে, কখনও নেমে যাচ্ছে এই রাস্তা, অনেক নীচে—খাদ বরাবর। দূরে 'ব্ল্যাক ক্যানিয়ানের' ভয়াল শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে।

ছুটন্ত গাড়ির জানালায় চোখ রেখে লক্ষ্য করলো জুপিটার। বললে গাড়ির চালককে লক্ষ্য করে—ওয়াদিটন, মনে হয় আমাদের 'ব্ল্যাক ক্যানিয়ানের' রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে।

ঠিক তাই। এরপরই পড়বে উইনডিং ভ্যালির রাস্তা।

ভালই হলো, এক কাজ কর ওয়াদিটন, তুমি গাড়িটা এখানে একটু থামাও, আমাকে নামতে হবে।

এখানে কেন? পীট জানতে চাইল। জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে বললো—দিনের আলোর মধ্যে আমি আর একবার ভালভাবে দুর্গটা দেখতে চাই।

জুপিটারের কথা মতো গাড়ি থামিয়ে দিলো ওয়াদিটন। গাড়ি থেকে নেমে পড়লো জুপিটার, ওর সঙ্গে পীট।

দিনের আলোতে পীটের আর ঠিক আগের মতো ভয় করছিল না তবু তার যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল জুপিটারের এই খামখেয়ালি অভিযানকে।

দূরে পরবর্তী ক্যানিয়নের শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের খাড়াই পাথর ভেঙ্গে অভিশপ্ত দুর্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল দুই সঙ্গী। এই দিকের রাস্তা ধরে তারা এর আগেও এসেছিল। কাজেই তাদের দুর্গের সামনের দিকে পৌঁছাতে কোন অসুবিধে হলো না।

সামনে একটা বড় পাথরের আড়াল টপকাতে পারলেই সেই দরজাটা। জুপিটার সবেমাত্র পা বাড়িয়েছিল দরজার দিকে। মুহূর্তে সে দেখতে পেলো ঝটকা বেগে দুটো ছায়ামূর্তি যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো দরজার বাইরে। চকিতে ঘটে গেল ব্যাপারটা। থমকে গেল দু'জনেই। পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে জুপিটার বললে তার সঙ্গীকে চাপা স্বরে—চুপ, কোন কথা বলো না। যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমনি দাঁড়িয়ে থাক।

মুহূর্তের মধ্যে ওই দুই ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল পাহাড়ের ঢালু খাদের দিকে।

এবার জুপিটার বললে—পীট, কি মনে হলো তোমার?

নিশ্চয়ই এবার ওই দুই মূর্তিকে তুমি অশরীরী বলবে না?

তা ঠিক—কিন্তু ওরা কারা, কিসের জন্যই বা এখানে এসেছিল?

তা জানি না তবে খুব ভয় পেয়েছে মনে হলো। চলো এবার দেখি ওরা কোন দিকে গেল।

পাথরের আড়াল থেকে এবার বেরিয়ে এলো দু'জনে। সামনে উঁচু পাহাড়ের খাড়াই পথ উঠে গেছে। মনে হয় এই দিকেই গেছে ওরা দু'জনে।

পীট বললে, সামনে কিছু ঝোঁপ দেখা যাচ্ছে। চলো এবার ওদিকটায় যাই, কেউ লুকিয়ে থাকলে ধরা যাবে।

আমারও তাই ইচ্ছে।

দু-একপাও এগুতে হলো না তার আগেই পীটের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো জুপিটার।

কি ব্যাপার পীট!

দেখ, এই টর্চটা। পাহাড়ের এই ঝোপের মধ্যে পড়েছিল। পীটের হাত থেকে জুপিটার হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিতে নিতে বললে; মনে হয় এটা ওই দু'জনের মধ্যে একজনের। ছুটে পালাবার সময় ওদের হাত থেকে পড়ে গেছে।

আমার তাই অনুমান।

জুপিটার টর্চটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলো। তারপর একসময় টর্চটার গায়ে ছোট্ট একটা টিনের পাতের ওপর খোদাই করা কয়েকটা অক্ষর লেখা দেখে থমকে গেল।

মনে হয় কারো নামের ইনিসিয়াল।

ই. এস. এন!

ভুরুতে টান পড়লো জুপিটারের। নিশ্চয়ই যার টর্চ তারি নাম লেখা। ভাবতে গিয়ে মুহূর্তে তার একটা নাম মনে হলো—এডওয়ার্ড স্কিনার নোরিস।

তাহলে কি নোরিসই এসেছিল? নিশ্চয়ই সে—সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। মুহূর্তে জুপিটারের মনে পড়লো ববের কথাটা। লাইব্রেরী রুম থেকে ববের কার্ডটা হারিয়ে গিয়েছিল, তখন সেই সময় তার পাশে ছিল এই নোরিস, সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে—তাছাড়া ববের নোটিং করার সময় সে পাশে বসে কাগজগুলো লক্ষ্য করছিল—তাও বব বলেছিল।

জুপিটারের যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারলো না সে। বরং সে এবার জুপিটারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো রোলস রয়েসের ড্রাইভার ওয়ার্দিংটনের কথা। এখানে আসার আগে কথায় কথায়

ওয়াদিটন বলেছিল গতকাল কেউ যেন তাদের গাড়িকে ফলো করছিল, আর সেই গাড়ির রঙ ছিল নীল। নীলরঙের গাড়ি তো নোরিস ব্যবহার করে। নিশ্চয়ই ওয়াদিটন মিথ্যে বলেনি কথাটা।

পীটের কথাকে সমর্থন করে জুপিটার বললে—ঠিক ধরেছ এটা আসলে নোরিসের কাজ।

কিন্তু এতে ওর লাভ কি। কিসের জন্য সে এসেছিল?

উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে, আর তা হলো নিজেকে জাহির করা। তুমি তো জানই ও আমাকে চিরকাল হিংসে করে, আমার চেয়ে ও যে অনেক বেশী বুদ্ধিমান তাই প্রমাণ করতে চায় সবসময়। এখানেও সে এসেছিল তাই প্রমাণ করতে। আমাদের কাজের ব্যাপারটাকে বুঝতে। যাক এখন ওসব কথা, চলো আমরা এখন এই ঢালু পথটা ধরে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করি।

জুপিটারের নির্দেশ পেয়ে পীট আবার হাঁটতে শুরু করলো।

পাহাড়ের এই দিকটা অসম্ভব ঢালু। ঢালু পথে ওপরে ওঠা খুব কঠিন। তবু ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো। পীট হাঁটু ভেঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে উঠছিল আগে আগে, তার পিছনে জুপিটার! দু'ধারে পাহাড়ি জঙলা গাছগুলো স্থির হয়ে আছে।

একসময় প্রচণ্ড জোর একটা শব্দ হলো। মনে হয় খানিকটা দূরে পাথরের বড় একটা চাঁই খসে গেল যেন। পীট থমকে গিয়ে পিছু ফিরে তাকালো জুপিটারের দিকে। মুহূর্তে জুপিটার তার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে সরিয়ে নিয়ে বললো, সরে এসো পীট।

কেন?

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ।

সামান্য সরে এসে সামনের দিকে চোখ রেখে চমকে উঠলো পীট। আতঙ্কে তার মুখের চেহারাটা বদলে গেল। কথা বলতে পারলো না কোন। কেবল শুনতে পাচ্ছিল চারপাশের পাহাড়ি নির্জনতা কাঁপিয়ে একটা বড় পাথরের চাঁই পাহাড়ের ঢালু গা ঘেষে ঘর্ষণের প্রচণ্ড শব্দ নিয়ে ধেয়ে আসছে তাদের দিকে।

জুপিটার বললে—ভয় নেই পাট, ওই পাথরের চাঁইটাকে নীচে গড়িয়ে পড়ার পথ করে দিয়েছি আমরা।

বলতে বলতে বিকট শব্দের আর্তনাদ তুলে পাথরের গোল চাঁইটা ওদের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। খানিক আগে পাট ঠিক ওই জায়গাতেই ছিল।

লক্ষ্য না করলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু এই কাজটা করলো কে? নিশ্চয়ই নোরিস, ও ছাড়া এমন বেয়াড়া কাজ কে করবে মনে হয় ওপারের ঝোপে ও-বেটা লুকিয়ে আছে। চলো ধরিগে।

কোন লাভ নেই। যিনি এই কাজ করেছেন, তিনি এখন আর এখানে নেই।

বুঝলে কি করে।

আমি একজনকে ছুটে চলে যেতে দেখেছি।

নিশ্চয়ই নোরিসকে দেখেছ।

না। ওর পক্ষে ওদিকে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। ও আগেই পালিয়ে গেছে। মানে তাহলে অন্য কেউ ছিল বলতে চাও।

হাঁ, তৃতীয় কোন ব্যক্তি। এখন আমাদের কাজ হলো সেই মানুষটার সন্ধান করা।

পাহাড়ের ঢালু পথ ধরে একসময় ওরা ওপরে উঠে এলো। এদিকে এর আগে আসেনি জুপিটার ও পাট। জায়গাটা অচেনা মনে হলো তারা যেন চেনা পথের ঠিক উল্টোদিকে এসে দাঁড়িয়েছে। ভালমতো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া এদিকটায় পাহাড়ের বিরাট চূড়া আকাশের দিকে অনেকখানি প্রায় আড়াল করে দিয়েছে। ফলে জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার হয়ে আছে। সামনের পাহাড়ের বুক চিরে একটা সরু রাস্তা কিছুটা নেমে গেছে নীচের দিকে। গিরিখাদের মধ্যে দিয়ে পথ চলা বিপজ্জনক। রাস্তা বোঝা যায় না তাছাড়া সংকীর্ণ অন্ধকার এমনিতেই ভয়ভয় করে রাখে পরিবেশকে।

জুপিটার এগিয়ে যায়। ওর পিছনে পাট। একসময় ওরা বুঝতে

পারে জায়গাটা ক্রমান্বয়ে অন্ধকারে চাপা পড়ে যাচ্ছে। জুপিটার লক্ষ্য করার চেষ্টা করে। কিছুই সে দেখতে পায় না।

পাট অন্ধকার সহ্য করতে না পেরে টর্চটা জ্বালালো। মুহূর্তে সেই আলোয় জুপিটার বুঝতে পারলো তারা একটা গুহা পথের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে। চমকে উঠলো পাঁট।

জুপিটারের কপালের রেখায় ভাঁজ পড়লো। সেও কিছুটা বিভ্রান্ত। ঠিক বুঝতে পারেনি এমনভাবে তারা একটা পাহাড়ের চোরা গুহার মধ্যে এসে পড়বে। কেউ কি ফাঁদ পেতে রেখেছিল তাদের জন্য? পাঁট বললে—চলো জুপ, আমরা বেরিয়ে যাই—

বেরুবার আর কোন রাস্তা নেই পাঁট।

মানে, যে পথ ধরে এলাম আমরা—

ওটা মনে হয় কেউ বড় পাথরের চাঁই ফেলে এতক্ষণে বন্ধ করে দিয়েছে।

কি করে বুঝলে।

হঠাৎ দেখলে না জায়গাটা কেমন অন্ধকার হয়ে গেল। সামনের প্রবেশদ্বার ঢাকা না পড়লে কিছুটা অন্তত আলো আমরা দেখতে পেতাম।

তাহলে উপায়?

তাইতো ভাবছি।

আমাদের কি তাহলে এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

তাই যখন তাদের অভিপ্রায়?

কাদের অভিপ্রায়!

যারা আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তুমি কি তাহলে বলতে চাইছ এইসব তারি কাণ্ড—মানে ওই ভয়ঙ্কর দুর্গের অভিশপ্ত আত্মার, কথাটা বলে কেমন যেন নিজের মধ্যে কুঁকড়ে গেল পাঁট।

অদ্ভুত একটা ভয়ার্ত ভাব সে অনুভব করলো নিজের মধ্যে। মনে হলো অন্ধকার গুহার মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা নীল মায়াবী মূর্তি যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। শুনতে পাচ্ছিল, তারা দু'জনেই

মৃদু পায়ের শব্দ···চাপা কান্নার স্বর। মনে হয় পাথরের মধ্যে চাপা পড়ে কেউ যেন কাঁদছে। তীব্র করুণ সেই আর্তনাদ।

জুপ, শুনতে পাচ্ছ কিছু ?

চুপ করো পাঁট, আমাকে ভাবতে দাও।

কি ভাববে তুমি।

বাইরে বেরুবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। অন্ততঃ যদি তাও না পার তো পাথরের কোন অংশকে ভাঙ্গতে হবে জোর করে, তা না হলে এই গুহার মধ্যে হাজার চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না আমাদের কান্না।

কিন্তু তা সম্ভব হবে কি করে ?

দেখি একবার চেষ্টা করে।

পাঁট কোন কথা বললে না।

অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে জুপিটার চারদিক লক্ষ্য করছিল।

একসময় পাঁট চমকে উঠলো। মনে হলো তার কানের পাশ ঘেসে কি যেন একটা উড়ে গেল। মৃদু স্পর্শ অনুভব করলো পাঁট। চমকে উঠে হাত দিয়ে ধরে ফেললো জুপিটারের একটা হাত।

জুপ !

ভয় নেই ওটা চামচিকে। চলো এগিয়ে যাই।

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে জুপিটার দেখতে পেলো গুহার এককোণে লোহার একটা পুরনো চিমনি পড়ে আছে। তার মনে হলো এই গুহায় নিশ্চয়ই কেউ থাকতো আগে—এসব তারি নিদর্শন। এবার সে একটা চারফুট লম্বা ইঞ্চি দুয়েক চওড়া লোহার লাঠি দেখতে পেলো। অনেকটা বর্শার মতো, তবে অতটা ছুঁচলো নয়। তার মনে হলো বস্তুটা হাতে নিয়ে, নিশ্চয়ই এটা দিয়ে মাংস পোড়ানোর কাজ হতো একসময়। জুপিটার এবার লোহার লাঠিটা পাঁটকে ধরতে বলে বললে : এগিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

কিন্তু এটা দিয়ে কি হবে জুপ।

কথা না বলে যা বলি তাই করো।

পীট নিঃশব্দে অনুসরণ করলো।

এবার টর্চের আলো ফেলে জুপিটার দেখতে লাগলো গুহার গাগুলো। নিকশ কালো পাথর। একসময় চারদিকে তাকাতে তাকাতে জুপিটার কি যেন দেখে থমকে গেল। তারপর পীটকে লক্ষ্য করে বললে—পীট ওদিকে তাকিয়ে দেখ, কিছু দেখতে পাচ্ছ?

সে রকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো।

পাবে, তার আগে এক কাজ করো। তুমি ওই লোহার লাঠি দিয়ে খুব জোরে জোরে পাথরটার গায়ে ধাক্কা দাও।

কিন্তু তাতে কি লাভ—

লোকসানও কিছু নেই, যা বলি তাই করো, তা না হলে আমাকে দাও ওটা। আমি কাজটা করছি।

পীট এবার কথা না বাড়িয়ে লোহার লাঠিটা হাতে নিয়ে জুপিটার যেভাবে বললে সেইভাবে খোঁচা দিতে লাগলো পাথরটার ওপর জোরে। বারবার জোরে খোঁচা দেওয়ার ফলে একসময় বড় একটা পাথরের খণ্ড খসে পড়লো। মুহূর্তে এক মুঠো আলো এসে পড়লো অন্ধকার ছিঁড়ে। যদিও স্পষ্ট নয়, তবু অন্ধকারের ঘনত্ব কিছুটা দূর হলো। অবাক বিস্ময়ে পীট ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বললে, আশ্চর্য জুপ, তোমার এত বুদ্ধি, সত্যি তোমার প্রতিভাকে তারিফ করতে হয়।

প্রতিভা নয় বন্ধু, আসলে চোখের নজর। গোয়েন্দাগিরিতে চোখটাই হলো আসল। আমি লক্ষ্য করেছি এখানকার পাথরের চাঁইগুলো আলগা আছে তাই তোমাকে ওভাবে খোঁচা দিতে বলেছিলাম। এখন দেখলে তো, আবার খোঁচা দাও দেখবে আরো কিছু আলগা পাথর খসে পড়বে।

পীট এবার উৎসাহী হয়ে খোঁচা দিতে লাগলো। আর তার ফলে ঝুপঝুপ করে খসে পড়লো কিছুটা পাথরের আলগা অংশ। এবার জায়গা অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেল। জুপিটার বললে, এবার নিশ্চিন্ত। এখন আমাদের এই ফাঁক দিয়ে বাইরে টপকে পড়তে অসুবিধে হবে না।

ঠিক তাই!

তাহলে তৈরি হয়ে নাও।

প্রথমে জুপিটার ও পরে পীট এই পাথরের কোঁকর টপকে বাইরে এলো।

বাইরে মাথার ওপর আকাশ। বুক ভরে নিশ্বাস নিলো ছ'জনে প্রথমে! তারপর জুপিটার বললে, চলো আর সময় নষ্ট করবো না, ওর্যাদিটন হয়তো আমাদের দেরী দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে।

চলো।

এবার তারা বেশ জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করলো পাহাড়ি রাস্তাটার দিকে। পিছনে একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছিল দুরন্ত, গভীর খাদের সেই অন্ধকারময় মরণগুহা। দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ি রাস্তার একপাশে ওর্যাদিটন রোলস রয়েস নিয়ে অপেক্ষা করছে!

গাড়িতে উঠে বসে এবার জুপিটার নির্দেশ দিলো ওর্যাদিটনকে উইনডিং ভ্যালির দিকে গাড়ি চালাতে।

গাড়ি ছুটে চললো নির্দেশ পেয়ে। খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল পীটকে। এখনও তার মধ্যে চাপা একটা ভয়ের ভাব প্রচ্ছন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। জুপিটারের দৃষ্টি গাড়ির জানলা টপকে উপচে ছিল বাইরের দিকে। পাহাড়ি রাস্তা উইনডিং ভ্যালি রোড. বেশ চওড়া। গাড়ি ছোটানোর পক্ষে খুবই আরামদায়ক। পাহাড়ের বাঁক টপকে ক্রমান্বয়ে তারা উঠে যাচ্ছিল উপরে। উপরের দিকে যত উঠছে, ততো সরু হয়ে আসছে রাস্তাটা। জুপিটার রেক্স'এর বাংলোটা চোখে পড়ে কিনা দেখার চেষ্টা করছিল। দেখতে দেখতে পাহাড়ি রাস্তা সরু হয়ে গেল ক্রমশঃ। এক সময় সামনের দিকে তাকিয়ে জুপিটার দেখতে পেলো ছুটো পাহাড় যেন ছ'ধার থেকে এসে মিশে গেছে পরস্পারের সঙ্গে, গাড়ি ছোটানোর মতো রাস্তা নেই। ওর্যাদিটন গাড়ি দাঁড় করালো।

জুপিটার নেমে পড়লো। সঙ্গে পীট। গাড়িতে ঠিক আগের মতো ওর্যাদিটনকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেল ওরা দুজনে।

বেশ কিছুটা পাহাড়ি ঢল ঘেসা রাস্তা ধরে এগুবার পর পীট বললে,

রাস্তাটা তো শেষ হয়ে এলো জুপ, তোমার রেক্স-এর বাংলোতো চোখে পড়লো না এখনো।

জুপিটার কোন জবাব দিলো না। সে গভীর দৃষ্টিতে চারদিক দেখে নিয়ে এবার পাহাড়ের অন্যদিকে খাদের মধ্যে যে রাস্তাটা সরু হয়ে নেমে গেছে সেই দিকে এগিয়ে গেল। দু'ধারে পাহাড়ি ঝোপে ভর্তি।

এক সময় পীট বললে, জুপ এই দেখ একটা ডাকবাক্স দেখা যাচ্ছে, কি যেন লেখা আছে ওই বাক্সটার গায়ে।

চলো একবার দেখি!

এগিয়ে গেল দুই সঙ্গী এবার ডাকবাক্সটার দিকে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই তাদের চোখে পড়লো রেক্স-এর নাম আর ঠিকানা লেখা। ৯১৫ নম্বর!—

এবার তারা ডাকবাক্সের ঠিক পিছনে একটা পাহাড় কেটে তৈরি রাস্তা দেখতে পেলো। জুপিটার পীটকে লক্ষ্য ক'রে বললে, চলো আমাদের এই সংকীর্ণ রাস্তাটা ধরে খাদের নীচে নামতে হবে।

দু-এক পা এগুতেই এবার তারা চোখের ওপর দেখতে পেলো পুরনো ধরনের স্পেন দেশীয় একটা বাংলো। জায়গাটার দু'ধারে পাহাড়ি বুনো জঙলা গাছে ভর্তি। বাংলোর কাছাকাছি গিয়ে তারা দেখতে পেলো, খাদের এক ধারের পাহাড়ের গা দিয়ে বাংলোর দেয়ালটা উঠে গেছে। খাদের পাহাড়ি দেয়াল ঘেঁসে সার সার সব বড় ধরনের খাঁচা, খাঁচায় কিচির মিচির করছে রঙ বেরঙের লম্বা লেজওয়ালা রঙিন টিয়াপাখির দল। এতক্ষণ তারা কোন শব্দ করেনি। খেলা করছিল নিজেদের মধ্যে। মানুষের পায়ের শব্দ শুনেই তাদের মধ্যে শিহরণের ঢেউ উঠেছে যেন।

জুপিটার ও পীট দু'জনেই এসে দাঁড়ালো খাঁচাগুলোর ধারে। জায়গাটা অন্ধকার। ভালভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর খানিক আগে আকাশ থেকে সরে গেছে সূর্য—তাছাড়া খাদের মধ্যে সূর্যাস্ত তাড়াতাড়ি হয়।

এক সময় তারা সেই অন্ধকারে শুনতে পেলো ঝোপের মধ্যে দিয়ে পা

ফেলে কেউ যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। শব্দ স্পষ্ট হতেই তারা দু'জনে এক সঙ্গে ঘুরে তাকালো।

অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখা গেল না। তবু সেই অস্পষ্টতার মধ্যে তারা দেখতে পেলো লম্বা ধরনের একজন মানুষ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। মানুষটার গলা জুড়ে দগদগে পুরনো ঘা—কানের পিছনের অংশতেও ছড়িয়ে গেছে। চোখে কালো কাচের চশমা। গম্ভীর গলায় লোকটা বললো তাদের—

যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমনি দাঁড়িয়ে থাক। এক মুহূর্ত নড়াচড়া করার চেষ্টা করো না। একটু নড়লেই তোমাদের বিপদ হবে—জীবনের প্রতি মায়া থাকলে সতর্ক হও তোমরা।

নির্জন অন্ধকার চিরে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর পীটের বুকের ভিতরটাকে ফালাফালা করে চিরে দিচ্ছিলো যেন। ভীষণ অস্বস্তিবোধ করলো সে। তারপর চকিতে দেখতে পেলো সেই দীর্ঘকায় মূর্তিটা এবার তাদের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাত থেকে জ্বলন্ত একটা দেশলাই-এর কাঠি ছাড়া পেয়ে বাতাসে ঘুরে এসে পড়লো ঠিক ওদের দু'জনের মাঝখানে। জুপিটার ও পীট—দু'জনেই স্থির—নড়ার সাধ্য নেই।

যা ফসকে গেল।

লোকটা আফশোষের সঙ্গে কথাটা বলে এগিয়ে এলো এবার তাদের মুখোমুখি। ভাল করে লক্ষ্য করলো। তারপর চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে তাকালো তাদের দিকে।

মুহূর্তকাল মাত্র। চোখের চশমা খুলে লোকটি এবার তাকালো। চোখের পলক সরে না যেন। পীটের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল তার চাউনি দেখে। ঠিক বাঘের জ্বলন্ত চোখের মতো দৃষ্টি মেলে ধরে আছে লোকটা। নিঃশব্দে সেই তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি যেন ওদের বুকের রক্ত চুষে নিচ্ছে। ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় এক সময় লোকটি বললে, তোমাদের ঠিক পিছনে একটা বিরাট সাপ ফনা উঁচিয়ে আছে—তোমরা কি দেখেছো তাকে।

কোন রকমে ঢোক গিললো পীট। তাকাতে পারলো না জুপিটারের দিকে। জুপিটার স্থির। চোখে আবার চশমাটা তুলে নিয়ে লোকটি

এবার বললে ; সাপটা বিষাক্ত কিনা জানি না, তবে বিষাক্ত হলেও হতে পারে। আমি সেই জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম তার দিকে।

ওরা কোন উত্তর দিলো না। কিন্তু পরক্ষণে লোকটি এবার অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলো, তারপর পকেট থেকে লাল সাদা রঙের একটা রুমাল বের করে মুখটা মুছতে মুছতে বললে, এতক্ষণ আমি একা হাতে জঞ্জাল সাফ করছিলাম। এই গরমে বড় ক্লান্ত হয়ে গেছি। জঞ্জাল সাফাই-এর কাজ তো সোজা কাজ নয়। তো এই সময় একটু লেবুর রস খেলে ভাল লাগবে—কি বলো তাই না ?

ওরা কোন কথা বললো না।

ওদের দিকে তাকিয়ে লোকটি বললে ; তোমরা নিশ্চয়ই রেক্স-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ?

হ্যাঁ।

চমৎকার, তাহলে চলো লেবুর রস খেতে খেতে কথা বলা যাবে—কি খাবে না তোমরা ?

আপত্তি করলো না ওরা কেউ। লোকটিকে অনুসরণ করে এবার ওরা বাংলোয় এসে পৌঁছলো। ঘরের এক কোণে একটা ইজিচেয়ার তাছাড়া একটা বড় টেবিলের পাশ ঘিরে আরো কিছু চেয়ার আছে। টেবিলের ওপরে ছোট একটা জারে এসিড—ঘরের মধ্যে একটা বড় পাখির খাঁচাও দেখতে পেলো তারা। পাখিগুলো সপ্রাণে ডাকছে। লোকটি এবার ওদের দু'জনকে দু'গ্লাস লেবুর রস দিয়ে বললে ; তোমরা খেতে লাগো, আমি আসছি। এখুনি।

কথাটা বলেই সে পাশের ঘরে চলে গেল। জুপিটার গ্লাসটা হাতে নিয়ে তাকালো পীটের দিকে। তার মনের সন্দেহ যেন দূর হয়নি। কিছু যেন ভাবছে সে। এক সময় পীটকে বললে, লোকটাকে তোমার কি রকম মনে হচ্ছে পীট।

খারাপ কেন হবে। কথা বলার আগে পর্যন্ত ভাল লাগছিল না সত্যি, তবে কথা বলার পর ভাল বলেই তো মনে হচ্ছে আমার।

তা ঠিক, তবে আমার একটা ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে—

কি ব্যাপারে ?

ও কি বলেছে শুনেছ তো, জঙ্গালে কাজ করছিল। যদি তাই হতো ওর হাতে পায়ে তো সে রকম কোন ময়লা লাগার চিহ্ন দেখলাম না।

তোমার আবার একটু বেশী বাড়াবাড়ি। কথাটা বলে হাতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে পীট বললে—জুপ, গ্লাসে তো লেবুর রস নেই। এ তো হুইস্কির স্বাদ।

আমি তা আগেই অনুমান করেছি। ওর কথাবার্তা কেমন যেন ভিন্ন রকমের।

পীট কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল তার আগেই দেখতে পেলো নতুন পোশাকে লোকটি ঘরে ঢুকলো। পরনে সাদা স্পোর্টিং গেঞ্জি, গলায় সুন্দর একটা সিল্কের কাপড় জড়ানো। গলার ঘা-টাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না আগের মতো।

লোকটি এবার বসতে বললে—বলো এবার শুনি, কি বলতে চাও তোমরা ?

জুপিটার তার পকেট থেকে তাদের তিন গোয়েন্দার পরিচয় পত্রটা বার করে এগিয়ে দিলো। লোকটি চোখ বুলিয়ে বললে—আচ্ছা, তোমরা তাহলে খুদে গোয়েন্দা। তা কি ব্যাপারে তদন্ত করছ তোমরা ?

জুপিটার এবার সরাসরি বললে, মিঃ রেক্স আমরা আপনার কাছ থেকে স্টিপেন টেরিলের বিষয়ে কিছু জানতে এসেছি।

টেরিল! রেক্স তার কালো চশমা চোখ থেকে সরাতে সরাতে বললেন ; দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় ভালভাবে তাকাতে পারি না। রাতের দিকে খালি চোখে দেখতে অসুবিধে হয় না আমার। তোমরা কি জানতে চাও টেরিলের বিষয় ?

জানতে চাই লোকটি কেমন ছিলেন। শুনেছি তাকে নাকি কোন অভিশপ্ত আত্মা খুন করেছে—আর তিনিও তাই ওই ভৌতিক অস্তিত্বের মধ্যে বেঁচে আছেন। কাজেই মানুষটির বিষয়ে জানা থাকলে তার আত্মার ব্যাপারে তদন্ত করাও আমাদের পক্ষে সহজ হবে বলে মনে হয়।

খুব ভাল প্রশ্ন। একটু থেমে রেক্স বললেন ; আমার বন্ধু স্টিপেনের বরাবরই অনুরাগ ছিল অলৌকিক, অস্বাভাবিক সব বিষয় নিয়ে

নাড়াচাড়া করা। মুভিতে সে দৈত্য, রাক্ষস, অলিক ছায়ামূর্তি এইসব চরিত্রতেই অভিনয় করে আনন্দ পেত। লোককে ভয়ের চেহারা দেখালেও মানুষ হিসাবে সে ছিল খুব লাজুক আর ভদ্রগোছের। বড় একটা লোকের সঙ্গে মিশতে পারতো না। তাছাড়া দিনরাত সে ব্যস্ত থাকতো ছবির কাজ নিয়ে।

কথাটা বলে টেবিল থেকে তিনি একটা ফটো তুলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন তাদের দিকে। ওরা তুজনেই ছবিটা লক্ষ্য করলো। ছবিতে দেখা গেল তুজন মানুষ পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করছেন। একজন লম্বা ধরনের তিনি হলেন দ্য উ্যইসপ্যারার অন্যজন সামান্য বেঁটে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সি। ছবি থেকে ওরা তুজনে মুখ তুলতেই রেক্স বললেন—আমি ওর ব্যবসা-পত্তর দেখতাম। ওর হয়ে লোকের সঙ্গে দেখাশোনা করতাম। বেশ দিন যাচ্ছিল আমাদের—ওর তখন খুব নামডাক। ওর শেষ তোলা ছবিতে লোকে যখন প্রথম ছবির পর্দায় ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, তখন সকলের সে কি হাসি। সকলের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ হবে দেখে মনের দিক দিয়ে খুব ভেঙ্গে পড়েছিল সে। তার ধারণা জন্মালো লোকে আর তাকে দেখতে চায় না। সেই কারণে সে তার পুরনো সব ছবিগুলোকে নষ্ট করবে বলে ঠিক করেছিল। আমি ওকে অনেক বুঝালাম। বললাম ছবি না করে উপায় নেই। ব্যাঙ্ক তার কাছে বাড়ি তৈরির জন্য অনেক টাকা পায়। তোমরা নিশ্চয়ই তার দূর্গের মতো বাড়িটা দেখেছ। ওই বিশাল বাড়িতেই একসময় আমিও তার সঙ্গে থাকতাম। ছবির কাজ ছেড়ে দিয়ে সে তখন ওই বাড়িতেই থাকতো সব সময়। কিছু বললেই বলতো কেউ আমাকে এই বাড়ি থেকে চিরকালের জন্য সরাতে পারবে না—আমি সরে গেলেও—আমার আত্মা সব সময় থাকবে এই দূর্গের মতো বাড়িটায়। এরপরের ঘটনা তোমরা সকলেই জান—তার গাড়িটাকে পাওয়া গেল একদিন ভাঙ্গা-চোরা অবস্থায় খাদের একধারে। আর সে—তার কথা আর কি বলবো তোমাদের। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এবার জুপিটার বললে ; তিনি নাকি একটা চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ পুলিশ পেয়েছিল—আর তা থেকেই আমাদের সকলের অনুমান সে হয়তো খাদের মধ্যে পড়ে মারা গেছে। একটু থেমে রেক্স বললেন; লোকে যে যাই বলুক, আমার মনে হয় এর পিছনে অন্য কোন আত্মার হাত আছে।

কি রকম!

সে কথা বলতে গেলে এই দুর্গ নির্মাণের আসল রহস্য তোমাদের জানাতে হবে। একটু থেমে বললেন আবার রেক্স, এই বাড়িটাকে ইচ্ছে করেই পুরনো দিনের দুর্গের মতো করে তৈরি করেছিল স্টিপেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা হয়েছিল এই বাড়ি তৈরির মাল মশলা। যেমন ধর, জাপানের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বাড়ির কাঠ, বড় বড় আদি প্রেতাত্মক হিসাবে চিহ্নিত মন্দিরের চূড়া, এইসব। ইংল্যাণ্ড থেকে এনেছিল সেই বাড়ির সরঞ্জাম, যেখানে একটি তরুণী প্রেমবঞ্চিত হয়ে বাবার পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করার পর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। রোম থেকে একজন মৃত অতৃপ্ত শিল্পীর অরগ্যান, শোনা যায় সেই শিল্পীর আত্মা এখনও নাকি এই অরগ্যানের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে আছে। রাত দুপুরে এই বাজনা শোনা যায়।

মিষ্টার রেক্সের কথা শুনতে শুনতে পীটের বুকের ভিতরে রক্ত যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছিল। রেক্স থামতেই সে বললে, ভূতের আড্ডা। যদি এই দুর্গটা সত্যি সত্যি ভূতের আড্ডা হয় তো জীবন্ত লোক এখানে বাঁচবে কি করে, ঠিক তাই। আমি তোমাদের সেই কথাই বলতে চাইছি। তাছাড়া আমি এখনো যখন এই বাড়ির কাছ দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাই তখনও শুনতে পাই আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর। দেখতে পাই সে যেন দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে ডাকছে।

এবার জুপিটার প্রশ্ন করলো।

আচ্ছা কাগজে পড়েছি এখানে নাকি এখনও পাইপ অরগ্যান থেকে মৃদু বাজনার শব্দ শোনা যায়। দেখা যায় নীল এক মায়াবী মূর্তি, আপনার কি মত এই ব্যাপারে। আমি নিজে কখনও এই সব দেখিনি। তবে স্টিপেন বহুবার বলেছে ওই মৃদু বাজনার কথা। বিশেষ করে এই

বাজনা নাকি স্পষ্ট শোনা যায় প্রজেক্শন রুমে, তখন ভিতরে ঢুকলেই বাজনা থেমে যায়।

পীট আলগোছে ক্যাকাশে চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকালো একবার জুপিটারের দিকে। রেক্স তার চোখে পুনরায় চশমাটা পরতে পরতে আবার বললেন, এখন এই দুর্গটা সত্যি ভুতুড়ে কিনা তা আমি হলপ করে বলতে পারবো না। তবে কেউ যদি আমাকে দশ হাজার ডলার দিয়েও বলে এখানে এক ঘণ্টা কাটাতে বা সামনের দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে, তা আমি পারবো না কিছুতেই।

রেক্সের কথা শেষ হলো। জুপিটার দ্রুত হাতে যেন কিছু একটা নোট করে নিলো। তারপর নোট বইটা পকেটে রেখে পীটের দিকে তাকিয়ে বললো, চলো এবার ওঠা যাক।

দিন কয়েক পরের ঘটনা :

তিন গোয়েন্দা তাদের হেড কোয়ার্টার্সে বসে কথা বলছিল। খানিক আগে তারা একটা অদ্ভুত খবর পেয়েছে জুপিটারের কাকীমার কাছ থেকে। ওদের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করে মহিলা বলে গেলেন জুপকে, কে নাকি একটা জিপসি মহিলা এসেছিল জুপিটারের খোঁজে। জুপিটার হাসপাতালে পায়ের ক্ষতটা দেখাতে গেছে শুনে বলে গেছে; এখন তার সামনে খুব বিপদ। তাকে বলতে সে যেন 'টি. সি' শব্দের বিষয়গুলোকে এখন থেকে এড়িয়ে চলে। এই দুটি শব্দ থেকেই তার বিপদ আসছে এমন কি তার পায়ে যে ব্যথা লেগেছে, সেটাও নাকি ওই 'টি. সি'র জন্য।

মহিলা ওদের মধ্যে কথাটা ছুঁড়ে চলে যাওয়ার পর, ওরা তিনজনেই ভাবতে বসেছিল ব্যাপারটা নিয়ে। জুপিটারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা'টা ছোট একটা টুলের ওপর রাখা ছিল। সে নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছিল ঘন ঘন। তারপর এক সময় বললে, বুঝেছি—টি. সি.

বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে। টেরর ক্যাসেল। আর এইজন্তই আমার পায়ে লেগেছে তাও সত্যি।

এবার দুই সঙ্গী তাকালো তার দিকে। জুপিটার এবার নব উদ্যমে বললে, আমার পা-টা ঠিক হতে আর বড় জোর দুটো দিন সময় লাগবে। কিন্তু তার আগে আমাদের অনেক কাজ আছে। দু'দিন তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। কাজেই আমার পরিকল্পনা মতো তোমাদের কাল সকালেই একবার রওনা হতে হবে ওই দুর্গের দিকে। তোমাদের কাজ হবে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই দুর্গের মধ্যে কাটানো। ক্যামেরা-টেপ সঙ্গে নিয়ে যাবে, প্রয়োজনে কাজে লাগাবে ও দুটোকে।

জুপিটারের কথায় বব তাকালো পীটের দিকে।

তারপর বললে—কাল তো হবে না, আমার খুব জরুরী কাজ আছে লাইব্রেরীতে—আমারও।

তাহলে। একটু ভেবে নিয়ে জুপিটার বললে, কাল যখন তোমরা কেউ যেতে পারবে না, তখন আজই রওনা হয়ে যাও। এখনো সূর্য অস্ত যেতে ঘণ্টা দুয়েক সময় বাকি আছে। দু'ঘণ্টা অনুসন্ধানের পক্ষে যথেষ্ট।

আজই!

হ্যাঁ।

তোমরা রিপোর্ট দিলে আমি সেইমতো নতুন পরিকল্পনা তৈরি করবো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্যামেরা আর টেপ নিয়ে দুই সঙ্গী বেরিয়ে পড়লো। বব গাড়িতে উঠতে উঠতে বললে, আশ্চর্য আমরা জুপিটারের কথায় আপত্তি করতে পারি না কেন বলতো, সব সময় ও নিজের মতটাই জুলুম করে চাপিয়ে দিতে চায় আমাদের ওপর।

এই শেষ আর আমি শুনছি না ওর কোন কথা।

আমিও।

গাড়ি ছুটে চললো ভয়ঙ্কর দুর্গের দিকে। বব পিছন ফিরে ঘন ঘন দেখার চেষ্টা করলো তাদের পিছনে কোন গাড়ি অন্য দিনের মতো ফলো

করছে কি না। নোরিসকে বিশ্বাস নেই, ছেলেটা একভাবে চিনে জোঁকের মতো লেগে আছে ওদের পিছনে। ববের ব্যস্ততা লক্ষ্য করে ওয়াদিটিন তাদের বললে; আজ তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, কেউ লক্ষ্য করেনি তাদের।

এক সময় গাড়ি এসে থামলো গিরিখাদের একেবারে শেষ সীমানায়। দু'জনেই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। তারপর কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে বব বললে পীটকে, চলো হে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সন্ধ্যে হওয়ার আগে ফিরতে হবে আমাদের।

চলো।

টেপটা হাতে নিয়ে ববকে অনুসরণ করলো সে। পাহাড়ের গিরিখাদের সংকীর্ণ পথ টপকে এবার দুই খুদে গোয়েন্দা এগিয়ে চললো দূর্গের দিকে। আবছা আলোয় ভয়ঙ্কর দূর্গটা অস্বাভাবিক ভয়ার্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো বব। তারপর সামনের দরজার লকটা ঘুরিয়ে দরজাটা সামান্য ঠেলা দিতেই, বিশ্রী একটা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ শরীরময় ছড়িয়ে গেল।

দরজার ভিতরে চোখ রেখে ববের মনে হলো, বিরাট একটা হা নিয়ে কেউ যেন অন্ধকারে তাদের গিলে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

বব বললে, কি বিশ্রী শব্দ, হঠাৎ করে শুনলে ভয় পাইয়ে দেয়। যদিও আমি ভয় পাইনি।

তুমি কি ভেবেছ আমি ভয় পেয়েছি। পীট বললে কথাটা।

কথা বলতে বলতে তারা ভিতরে ঢুকে পড়লো।

এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আবার একটা দরজা। ওই দরজা খুলে তারা প্রবেশ করলো বড় হলঘরের মধ্যে। জুপিটার বার বার করে বলে দিয়েছে অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই ছবি তুলে নিতে। বব তাই ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখছিল। দেয়ালের গায়ে ঝোলানো বহু ধরনের ছবি। বব ছবিগুলোর মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না। তবু তার মধ্যে থেকে দু-একটা ছবির ফটো সে তুলে নিলো। দেয়ালের গায়ে মিষ্টার টেরিলের ব্যবহৃত বিচিত্র ধরনের পোশাক ঝুলছে। উঁচু একটা

পাথরের ফাটলের কোল বেয়ে বাইরের রোদ ঝরে পড়ছে। দেখা যাচ্ছে চারদিক এখন স্পষ্ট। ঘরের পুরনো জানলা, উঁচু পাথরের দেয়াল আর সব বিচিত্র ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বব বললে; সত্যি এক নজরে দেখলে জায়গাটা একটা মিউজিয়াম বলে মনে হয়। কি পীট, তুমি ঠিক কোন মিউজিয়াম দেখতে আসার মতো অনুভূতি টের পাচ্ছ না?

ঠিক তাই। মিউজিয়ামের মতো এখানেও মৃত মানুষের আড্ডা। চারদিকে মৃত্যুর গন্ধ···

চারদিকে মৃত্যু···মৃত্যুর গন্ধ···মৃত্যুর গন্ধ···খানখান গমগম হয়ে শব্দটা ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

শব্দ মিলিয়ে যাওয়ামাত্র বব বললো—আশ্চর্য এটা প্রতিধ্বনি।

প্রতিধ্বনি—প্রতিধ্বনি—প্রতিধ্বনি!

পীট এবার ববের একটা হাত ধরে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। বললে—এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে কোন লাভ হবে না। আমাদের সব কথাই প্রতিধ্বনিত হবে।

ববের কাছে বেশ ভাল লাগছিল ব্যাপারটা। তার কাছে প্রতিধ্বনির শব্দটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল। তাই সে পীটের সঙ্গে এগুতে এগুতে নিজের মনেই প্রতিধ্বনি শোনার জন্য বলতে লাগলো—কে? কে? কে? শব্দ ছড়াচ্ছিল চারদিকে।

কে? কে? কে?

কিছুটা এগিয়ে এসে পীট ববকে বললে, তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো?

কি জিনিস?

একটা চোখ। ঠিক বাঘের মতো—নীল—জীবন্ত—তীব্র—নিজের চোখে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না।

পীট কথাগুলো বলে গেলেও বব যেন সে কথায় খুব গুরুত্ব দিলো না। সে ঘরের একপাশে পুরনো আমলের কয়েকটা চেয়ার দেখতে পেলো। বললো একটা চেয়ারে বসতে বসতে—দাঁড়াও ভাল করে বসে চারদিকটা দেখে নিই—অনুসন্ধান করার মতো কিছু আছে কি না।

ববের দেখাদেখি পীটও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

একসময় বব বললে—ছোট একটা বারান্দা মতো দেখা যাচ্ছে যেন, মনে হয় ওই বারান্দা দিয়ে ছবিগুলো ঝোলানো আছে তারের সঙ্গে।

ঠিক তাই

চলো তাহলে আমরা ওই বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো পরীক্ষা করি।

এবার তারা উঠে এগিয়ে গেল হলঘরের অন্য প্রান্তে যেখানে ছোট সিঁড়ি আছে—ওপরে ওঠার জন্য। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে বব এগিয়ে যেতে লাগলো

সিঁড়ির মুখে পা দেওয়ামাত্র চমকে উঠলো বব। তার মনে হলো পিছন থেকে হঠাৎ একটা হাত এসে যেন তার কাঁধের ক্যামেরাটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই মাটিতে পড়ে গেল বব। দেখতে পেলো চোখের সামনে ভয়ানক এক বর্ম পরা মূর্তি। হাতে লম্বা একটা তরবারি নিয়ে বর্ম পরা মূর্তিটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। হাতের তরবারিটা ভয়ানকভাবে সমানে ছুঁড়ে দিচ্ছে সামনের দিকে। বব আত্মরক্ষার জন্য গড়িয়ে গেল কিছুটা। দেখতে পেলো শুয়ে শুয়ে লোকটার তরবারি মাটিতে আঘাত করলো। গলায় কোন স্বর এলো না ববের। পীটকেও সে তার চারপাশের মধ্যে খুঁজে পেলো না। তারপর চকিতে সেই বর্ম পরিহিত ছায়ামূর্তি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ববের মনে হলো বর্ম থেকে খসে গেল মূর্তি, পাথরের দেয়ালের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল বর্ম ঢাকা সেই মানুষটা।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো বব। তাকালো। আগের তুলনায় চারপাশ একটু বেশী অন্ধকার বলে মনে হলো তার। চুপ করে সে শুনতে পেলো পাথরের আড়াল থেকে কেউ যেন কাঁদছে···কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

ঝমঝমে একটা ভাব ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

বব উঠে দাঁড়ালো। ক্যামেরাটা তুলে নিলো হাতে। তারপর একসময় কি দেখে থমকে গেল। তারপর দ্রুত ক্যামেরাটা চোখের কাছে তুলে ক্লিক করে কোন কিছুর একটা ছবি তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে—তা দারুণ দেখাচ্ছে তোমায় পীট। তোমার চেহারাটা দেখলে নিশ্চয়ই জুপ খুব খুশী হবে। ঠিক যেন একটা ভূত কাঁদছে।

ববের কথায় পীটের কান্না থেমে গেল। লজ্জিত স্বরে চেয়ারের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, সত্যি বব আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। বর্ম পরা লোকটা যে ভাবে তোমাকে তাড়া করেছিল।

বব কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই তার চোখে পড়লো মাটিতে বর্মের সেই ছায়া মূর্তিটা যেন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তারা এগিয়ে গেল। বব পরীক্ষা করে বর্মটা হাতে তুলে বললে—সব ফাঁকা, কেউ নেই এর ভিতরে—দাঁড়াও একটা ছবি তুলে নিই বর্মটার।

ছবি তোলা শেষ করে বব তাকালো পীটের দিকে। তারপর বললে—তোমার কান্না যদি থেমে গিয়ে থাকে তো চলো, আমরা এবার এগিয়ে যাই—কিছুটা দূরে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে।

ওরা এগিয়ে গেল সেদিকে। দেখতে পেলো দরজার ওপরে লেখা প্রজেক্‌শান রুম। ভিতরে ঢুকলো, পুরনো দিনের একটা ঘর। সাদা কাপড় টাঙানো আছে একদিকে। ঘরে ছড়ানো বেশ কিছু চেয়ার। বব বললে; মিষ্টার টৌরিল মনে হয় এই ঘরে বসে তার মুভিগুলো দেখতেন।

বব এবার অন্ধকারের মধ্যে ভালভাবে দেখার জন্য তার টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। খানিক আগে পড়ে যাওয়ার জন্য টর্চটা মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে। পীট এবার মেরামতের জন্য টর্চটা হাতে নিলো। তারপর কিছুক্ষণ কসরৎ করার পর জ্বালালো টর্চটাকে। পরিষ্কার আলো এলো না। তবু—নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। এই আলোতেও কিছু দেখা চলবে অন্ধকারে।

পীট বললে ববকে—চলো এখানে আর অপেক্ষা না করে ছবিগুলো একবার দেখি। সেই চোখ—যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।

আপত্তি করলো না বব। তারা এবার প্রোজেক্‌শান রুম থেকে বেরিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছুলো ব্যালকনিতে। তারপর মোটা তারের সঙ্গে ঝোলানো ছবিটা টেনে তুললো।

ছবিগুলো শক্ত ভারি ফ্রেম দিয়ে মোড়া। টেনে তুলতে কষ্ট হচ্ছিলো। তবু তারা দু'জনে মিলে ছবিটা টেনে তুললো।

আলোয় ছবিটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বব ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললে, খুব সাধারণ ছবি—এর মধ্যে আবার দেখার কি আছে।

ওই চোখটা—জান না গতদিন আমি আর জুপিটার এই চোখজোড়া দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।

বব হেসে বললে—তৈলচিত্র—সেইজন্য এত চকচকে।

ঠিক জীবন্ত তাই না? পৌট বললো কথাটা।

আবার তারা ছবিটাকে নামিয়ে রাখলো আগের জায়গায়। এবার তাদের চোখ পড়লো দুর্গের অনেক উঁচুর দিকে একটা জানলায়। দেখতে পেলো সিঁড়িটা ওপরে উঠে গেছে। তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলো। তাকালো চারিদিকে ভালভাবে।

বব বললে—পৌট ভাল করে তাকিয়ে দেখ, কিছু দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ একটা টেলিভিশন এরিয়াল।

ঠিক তাই। মনে হয় খুব কাছে কোথাও আর একটা গিরিখাদ আছে—কেউ থাকে ওখানে।

ঠিক তাই। এই ধরনের পাহাড়ি অঞ্চলে তো সংকীর্ণ গিরিখাদের অভাব নেই। আর জায়গাগুলো খুব নির্জন হয়।

তা ঠিক। তবে এই অঞ্চলটার মতো ওই জায়গাটা এতো নির্জন নয়।

আর একটু এগিয়ে চলো দেখি। আপত্তি নেই তো?

না, চলো। ঘুরে দেখা যাক চারদিকটা।

এবার দুজনে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলো। দেখার মতো কিছুই চোখে পড়লো না। তারপর আবার দুজনে নেমে এলো নীচে। নীচে নেমে এবার তারা সিঁড়ির নীচে ছোট একটা ঘর দেখতে পেলো। মনে হয় স্টিপেন টেরিলের লাইব্রেরী রুম হবে এটা। বিস্তর সব বইপত্তর। এই ঘরের আরো কিছু ছবি তাদের নজরে পড়লো।

বব লাইব্রেরী রুমের ছবিটা তুলে নিলো ক্যামেরায়। তারপর পৌটের দিকে তাকিয়ে বললে—এইসব ছবি স্বয়ং টেরিলের—বিভিন্ন পোশাকে তোলা। সত্যি এখন টের পাচ্ছি কেন তাকে সকলে 'দ্য ম্যান অফ্ মিলিয়ান ফেসেস' বলতো।

এবার তারা লাইব্রেরী রুমের একপাশে যেতেই থমকে গেল। কিছু একটা যেন নজরে পড়লো তাদের।

পাঁট অস্ফুট স্বরে বললো, মমিকেস।

হ্যাঁ মনে হয় বহুকালের পুরনো। কোন ইজিপসিয়ান মমিকেস হবে এটা, চলো একবার দেখিগে।

দেখবে!

বব জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল মমিকেসের দিকে। কেসের ওপরের ঢাকনার ওপর একটা রূপোলী পাতে লেখা, দু'জনের নাম! প্রথম মিষ্টার হিগ উইলসন, যিনি এই মমির প্রকৃত মালিক। দ্বিতীয় মিষ্টার স্টিফেন টেরিল, যিনি পরে মমির মালিক হয়েছেন.

পাঁট বললে আলতো গলায়, এই কেসটার মধ্যে সত্যি কি কোন মমি আছে বব, তোমার কি মনে হয়?

মমি না থাকলেও মূল্যবান কিছু সামগ্রীতো আছেই

খুলে দেখবো একবারি।

দেখাই যাক না।

পাঁট এবার মমিকেসের ঢাকনাটা খোলার চেষ্টা করলো। প্রচণ্ড শক্ত। যদিও কেসের পাল্লায় কোন চাবি দেওয়া ছিল না, তবু ঢাকনাটা খুলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। একসময় পাঁট বহু কষ্টে ঢাকনাটা খুলে ফেললো। তারপর দ্রুত ঢাকনাটা আবার নামিয়ে রাখলো আগের মতো।

দেখলে কি আছে ভিতরে?

হ্যাঁ।

একটা কঙ্কাল, মানুষের বলেই মনে হয়, তাই না?

আমাদের যেন গিলে খেতে চাইছে।

ঠিক তাই।

আর একবার ঢাকনাটা তোলো, একটা ছবি তুলে নিই।

ছবি তুলবে?

হ্যাঁ! ভয় নেই, কঙ্কাল ভূত নয়, যে আমাদের ঘাড় মটকাবে।

তা নয়, তবে কঙ্কাল থেকেই তো ভূত হয়। আচ্ছা এটা কার কঙ্কাল বলে মনে হয় তোমার? মিষ্টার টেরিলের কি?

তা জানি না, তবে ছবিটা তুলে নেওয়া দরকার।

বাধ্য হয়ে পীটকে আবার মনিকেসটা খুলতে হলো। সে বললে, তাড়াতাড়ি ছবিটা তুলবে কিন্তু, চেষ্টা করবো, তবে কঙ্কালটা যদি মুখে হাত ঢাকা দেয় তো, জানি না কি হবে। সবটা বলে বব হাসলো পীটের দিকে তাকিয়ে।

পীটের মুখটা শুকিয়ে গেছে। তার যেন এইসব ইয়ার্কি ভাল লাগছিল না। আলো কমে আসছে। অন্ধকার লেগেছে দুর্গের মধ্যে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। আগের তুলনায় আরো অস্পষ্ট।

ছবি তোলা হলে পীট ববকে বললো, চলো, আর দেরী করা উচিত নয়, আলো কমে আসছে।

বব বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে।

সত্যি ভীষণ অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার।

বব বললে, আমরা কোথা থেকে ভিতরে ঢুকেছিলাম পীট।

মনে হয় সামনের দিকে আমাদের বেরুবার রাস্তা। অন্ধকার হাতরে দু'পা এগিয়ে পীট আর ববকে দেখতে পেলো না। অন্ধকার যেন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সে যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে অসংখ্য কঙ্কালকে। তারা যেন দু'হাত তুলে তার দিকে এগিয়ে আসে। পীট ভয়ার্ত স্বরে বললে, বব কোথায় তুমি? আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।

আমিও, টর্চটা জ্বালো পীট।

টর্চ!

পীট খুঁজলো নিজের টর্চটাকে। খুঁজে পেলো না। তারপর হঠাৎ তার মনে হলো সে তার টর্চটাকে মনিকেসের মধ্যে ভুলে রেখে এসেছে। বললে তাই অস্ফুট স্বরে, আমি টর্চটা ভুলে মনিকেসের মধ্যে রেখে এসেছি বব।

তাহলে উপায়।

কোথায় তুমি?

অন্ধকার হাতড়ে ববের হাতটা ধরলো পীট। বব বললে, ভুলেও যেন আমার হাত ছেড় না। কিন্তু এমনিতে একটু আলোর দরকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না যে।

কি হবে বব ?

আবার যাব কিনা ভাবছি।

কোথায় ?

তোমার টর্চটা মনিব্যাগ থেকে বার করে আনতে।

অসম্ভব।

মুহূর্তে ববের মনে পড়লো তার নিজের টর্চের কথা। দ্রুত পকেট থেকে নিজের টর্চটা বার করে বললে, আরে আমার কাছেই তো একটা টর্চ আছে, দেখ সব ভুলে মেরে বসে আছি।

তাই তো, জ্বালো তাহলে।

কিন্তু এতোতো আলো খুব একটা জোর হবে না।

যা আছে তাতেই কাজ হবে।

বব টর্চটা জ্বালালো। মোমবাতির চেয়েও ক্ষীণ আলো। এবার তারা সেই ক্ষীণ আলো দেয়ালের গায়ে ফেলে দরজা খুঁজতে লাগলো। তারা একসময় অনুভব করলো, তারা একটা ছোট ঘরের মধ্যে দিয়ে অন্য আর একটা ঘরে এসে পড়েছে। ঠিক যেন গোলকধাঁধার মতো, গায়ে এত ঘর, এত ছোট দরজা যে কিছু তারা বুঝতে পারছিলো না কোন দিকে চলেছে। এক সময় একটা দরজা দেখতে পেলো বব। দরজাটা বন্ধ। খোলার চেষ্টা করলো সে। ভীষণ শক্ত মনে হলো। অন্যদিক থেকে দরজাকে কেউ টেনে ধরে রেখেছে। বব দরজা খোলার চেষ্টার মধ্যে পীট এক সময় তার কাঁধের কাছে হাত দিয়ে কিছু যেন বলার চেষ্টা করলো।

বব তাকালো।

অস্পষ্ট অন্ধকারে পীট বললে—কিছু শুনতে পাচ্ছ ?

চাপা কণ্ঠস্বরে বব উত্তর দিলো কোন রকমে, হ্যাঁ—

ঠিক একটা চাপা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে না শব্দটা।

হ্যাঁ।

কি মনে হয় তোমার ?

ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

ওরা দু'জনেই যে ওই ক্যাসক্যাসে কান্নার স্বরে ভয় পেয়েছে বেশ বোঝা গেল। এবার শব্দটা যেন আরো বাড়লো। ছড়িয়ে যেতে লাগলো চারদিকে। বব কান খাড়া করে শুনতে শুনতে বললে—মনে হচ্ছে এখন যেন অরগ্যান বাজাচ্ছে।

তাই ?

কোনদিক দিয়ে সুরটা ভেসে আসছে বলে মনে হয় তোমার।

বলতে পারবো না ঠিক। তবে চলো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

দরজা খুঁজে পেয়েছ কি। আমার মনে হচ্ছে আমরা ভুল করে প্রজোকশান রুমের সামনে এসে পড়েছি।

কি করে বুঝলে ?

ওই অরগ্যানের শব্দ শুনে তাই মনে হচ্ছে। শুনেছি এই ধরনের সুর লহরী প্রজ্যেকশন রুম থেকেই ভেসে আসে।

এবার তারা আবার বাইরে বেরুবার জন্য অন্যদিকে হাঁটতে লাগলো। ওই শব্দ যেন তাদের পিছু তাড়া করেছে। কিছুতেই তারা পাচ্ছে না ওই শব্দের বাইরে যেতে।

বব বললে—আশ্চর্য পীট, আবার আমরা প্রজ্যেকশান রুমের কাছে এসে পড়েছি সত্যি।

পীট লক্ষ্য করলো। সত্যি সেই ঘর···ছোট ছোট চেয়ারে ঘরটা ভর্তি। হঠাৎ করে সেই চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো পীট। সে দেখতে পেলো অসংখ্য কঙ্কাল যেন প্রজ্যেকশন রুমের চেয়ারে বসে আছে। সামনের সাদা পর্দাটা ধীরে ধীরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে অদ্ভুত এক মায়াবী মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে তাদের চোখের ওপর।

পীট ওদিকে তাকিয়ে আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। ববকে বললে ক্ষীণ ভয়ার্ত গলায়—কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

হ্যাঁ। সেই অশরীরী আত্মা।

নীল মায়াবী মূর্তি।

আর এখানে নয় বব, তাড়াতাড়ি চলো।

এক হেঁচকা টান মেরে ববের হাতটা ধরে বাইরে বেরিয়ে এলো পীট। বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলো আবার সেই অরগ্যানের সুর···সুর লহরী প্রচণ্ড শব্দে যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

অন্ধকারে ওরা দু'জনে প্রাণপণে এগিয়ে যেতে লাগলো। এবার—হিস্-হিস্ শব্দে মনে হলো কেউ যেন তাদের পাশাপাশি হাঁটছে।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে পীটের।

বেশ স্পষ্ট দেখতে পায় অন্ধকার ঘিরে একটা সাদা হাত তার কাঁধে হাত রাখতে চাইছে।

কে?

কে!—কে—? কে?

শব্দ ছড়িয়ে যায় চারদিকে?

বুকের ভিতরটা খানখান হয়ে যায় পীটের।

পীট।

পীট—পীট—পীট!

এই শব্দের মধ্যে আবার দুই বিচ্ছিন্ন বাহু একত্রে মিলিত হয়ে পরস্পরের হাতকে চেপে ধরলো।

তারপর বব বললে—একটা ইঁদুর মনে হয় আমার পা ছুঁয়ে গেল।

আমার ভীষণ ভয় করছে, মনে হচ্ছে সে—

কে?

সেই কঙ্কাল···সেই নীল মায়াবী মূর্তি—

নীল মায়াবী মূর্তি?

হ্যাঁ। আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি তাকে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি···স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি—স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।

চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া শব্দের মধ্যে বব বললে পীটকে—আমরা ইকো হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি পীট। মনে হয় আর একটু এগুলেই দরজা খুঁজে পেয়ে যাব।

এবার তারা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এগুলো আরো কিছুটা। একসময় তারা দু'জনে আবার শুনতে পেলো কিছু একটা শব্দ? মনে হলো অন্ধকার ঘেঁষে কেউ যেন তাদের দিকে হেঁটে আসছে। পরিষ্কার তারা কিছু দেখতে না পেলেও, বুঝতে পাচ্ছিলো ওই শব্দ সেই অশরীরী আত্মার ছাড়া আর কারো নয়। বব পিছু ফিরে তাকালো একবার।

তার মনে হলো খনা গলায় কেউ যেন তাকে বলছে—পালাচ্ছো কেন তোমরা, দাঁড়াও···দাঁড়াও না আর একটু।

ববের বুকের রক্ত যেন হীম হয়ে আসে।

কোন রকমে সে দরজা খোলার চেষ্টা করে। আর তারি মধ্যে দেখতে পায় একটা হীম শীতল লোমশ হাত তার কাঁধের ওপর রেখেছে।

পীট :

দরজাটা কোন রকমে খুলে ছুটতে থাকে বব। ওর পিছনে পীট ছুটছে কিনা সে বুঝতে পারে না। কেবল দেখতে পায় একটা নীল মায়াবী মূর্তি তার পাশাপাশি ছুটছে। লোমশ একটা হাত তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে।

দিন তিনেক পর। জুপিটারের ঘরে বসে কথা হচ্ছিলো।

তারপর কি হলো বব, নীল মায়াবী মূর্তিটা তোমার কাঁধের ওপর হাত রাখলো? জুপিটার প্রশ্ন করছিল। উত্তর দিচ্ছিলো বব ও পীট।

কি আবার হবে, আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। বব চীৎকার করছিল। আর চীৎকারটা আরো বাড়লো যখন আমি ওর হাতটা ধরার চেষ্টা করলাম।

বব গর্জে উঠলো। বললে—বাজে কথা রাখ, তুমি যে আমার হাতটা ধরেছ আমি তা লক্ষ্য করেছি।

জুপিটার ওদের দিকে তাকিয়ে এবার বললে—দেখ এটা ঝগড়া করার ব্যাপার নয়। আমি তোমাদের একটা জরুরী ব্যাপারে তদন্ত করতে পাঠিয়েছি। তবে তোমাদের কথাবার্তা শুনে এটুকু বুঝলাম, তোমরা আসলে ভয়ই পেয়েছ, কাজের কাজ কিছু হয় নি। থাক সে কথা—এখন ছবিগুলো তোমাদের দেখাই।

কথাটা বলে জুপিটার ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করলো। অন্ধকার ঘর, এবার সে ক্যামেরার ছবিগুলো ছোট একটা আলো জ্বালিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর বললে—ছবি তুলতে তোমাদের কেউ নিষেধ করেনি বোঝা যাচ্ছে।

তা করেনি।

এবার দেখ ছবিগুলো থেকে আমরা কি পাচ্ছি—একটু থেমে বললো জুপিটার—বর্মের যে ছবি তুলেছ, তা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা খুব পুরনো নয়। বেশ চকচক করছে।

এবার লক্ষ্য করো লাইব্রেরী রুমের ছবিটা।

নতুনত্ব কিছু দেখতে পাচ্ছ কি।

না।

বইগুলো ভালভাবে সাজানো বলে মনে হচ্ছে। আর বইগুলোও যে খুব একটা পুরনোও নয়, তাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ছবিতে—তাই না?

ঠিক তাই।

এবার মমিকেস। আমার অনুমান এই কঙ্কালটা কারো কাছ থেকে স্টিপোনের উইল সূত্রে পাওয়া—এই ধরনের উইল প্রাপ্ত সম্পত্তি সত্যি অবাক হওয়ার মতো ঘটনা।

এবার জুপিটার ছবিগুলো আবার নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিয়ে বললো—আমি একটা জিনিস তোমাদের দায়িত্বে দেব। মন দিয়ে শোন ব্যাপারটা। কথাটা বলে সে তিনটি বড় আকারের খড়ি চক বার করলো। তারপর ববকে সবুজ রঙের চক, পীটকে নীল রঙের চক ও নিজে একটা সাদা রঙের চক নিলো।

কি হবে এই চক দিয়ে?

এই চক দিয়ে এবার আমাদের সত্যিকার তদন্তের কাজ শেষ হবে। একটু থেমে জুপিটার বললে; আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ট্রেডমার্ক জানি—সেই মতো যে যেখানে তদন্তের জন্য যাব এখন থেকে সেখানে আমরা আমাদের চক ব্যবহার করবো। আর রঙের চেহারা দেখে আমরা বুঝে নেব এই চিহ্নগুলো কার দেওয়া।

দারুণ আইডিয়া—

শোন জরুরী কথা আছে, আজ খানিক আগে আমি মিঃ হিচককের সেক্রেটারীর কাছে ফোন করেছিলাম: সে জানিয়েছে মিঃ হিচকক্ আর অপেক্ষা করতে নারাজ—তাকে কালকের ভিতরে খবর দিতে হবে আমাদের।

বেশ তো দিয়ে দাও। দুর্গটাতো সত্যি ভতুড়ে—প্রমাণ চাই। প্রমাণ ছাড়া কোন কাজ হবে না।

প্রমাণ এর পরেও?

হ্যাঁ! প্রমাণ ছাড়া শুধু মুখের কথায় মিঃ হিচকক্‌কে বোঝানো যাবে না। কাজেই ভুতুড়ে ব্যাপারটা আজ রাতের মধ্যেই আমাদের প্রমাণ করতে হবে।

আজই—

এখনই। খানিক সময়ের মধ্যে আমি তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। আমাদের সঙ্গে থাকবে বব আর ওয়ার্দিংটন। গাড়ি তৈরি।

ওরা কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। সমস্ত আপত্তিগুলো ওদের মনের মধ্যে জট পাকিয়ে গেল। কেবল তারা দেখতে পেলো—বব টেবিলের ওপর বড় করে সাদা খড়ি দিয়ে আঁক কাটছে—?

গাড়িতে বব আর ওয়ার্দিংটন অপেক্ষা করলো। পীট আর জুপিটার হেঁটে যাচ্ছিলো সামনের অন্ধকার পাহাড়ি খাদের রাস্তা ধরে ভয়ংকর দুর্গের দিকে। চারদিক নির্জন অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই—কেবল গুটি কয়েক তারা ফুটে আছে।

জুপিটার অন্য দিনের তুলনায় খুব একটা জোরে হাঁটতে পারছিল না। পা টেনে হাঁটছিল। পায়ের ব্যথাটা এখনো ভালভাবে সারেনি তার। খুব সন্তর্পণে পাথরের ওপর পা ফেলছিল। সামনের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো ওরা দু'জনে। এগিয়ে গেল। আজ ইচ্ছে করেই

তারা অন্যদিক থেকে পরীক্ষা করা শুরু করলো। এক সময় লক্ষ্য করলো তারা ছোট একটা দরজা। দরজা দিয়ে পাথর কেটে সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। জুপ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা চিহ্ন আঁকলো তার সাদা খড়িটা দিয়ে—তারপর ভিতরে নামলো। ওর পিছনে পীট—সেও চিহ্ন দিলো। এবার তারা সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নীচে নেমেই দেখতে পেলো একটা ভারি সুন্দর ঘর। রকমারি আসবাবপত্রে সাজানো।

জুপিটার বললে—এটা একটা সাজঘর বলেই মনে হচ্ছে।

তা নয় বুঝলাম। কিন্তু জায়গাটা আমার মোটেও ভালবোধ হচ্ছে না। ভীষণ চাপা, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

জুপিটার চারদিকে তাকালো। মুহূর্তে তার মুখ চোখ বদলে গেল। কিছু একটা যেন সে দেখতে পেয়েছে। নিজের মধ্যে সম্বিত ফিরে পেয়ে জুপিটার বললো—কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

ভাল করে তারা এবার সেই মূর্তিটাকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলো। মূর্তিটা একটা নারীর, বহুকালের পুরনো পোশাক পরণে তার। ঘাগরার মতো পা পর্যন্ত ঢাকা তার গলায় মোটা দড়ি বাঁধা। দড়িটা তার পা পর্যন্ত নেমে এসেছে। মেয়েটি যেন তাদের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে।

জুপিটার কিছু বলার আগেই পীট বললে, সেই মেয়েটি নয় তো, যার কথা মিঃ রেক্স আমাদের বলেছেন।

কথাটা এবার মগজে ঢুকতে দু'জনেই যেন স্থির হয়ে গেল। রক্ত শুকিয়ে গেল তাদের। নড়তে পারলো না। মেয়েটি বড় বড় চোখ নিয়ে মনে হলো তাদের ডাকছে। ঘরের মধ্যে ফিসফিসে শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো স্পষ্ট। একসময় জুপিটার বললে—তোমার হাতের টর্চটা একবার জ্বালো। তবে এখন নয়, যখন বলবো।

কথাটা বলেই জুপিটার এক মুহূর্তের মধ্যে নিজের হাতের টর্চটা ঠিক করে নিয়ে পীটকে ইশারা করলো। মুহূর্তে ওদের দু'জনের হাতের টর্চ অন্ধকার চিরে জোরালো হয়ে পড়লো মেয়েটির মুখের ওপর। সেই আলোয় ওরা বুঝতে পারলো নিজেদের ভুলটা।

জুপিটার বললে—এটা একটা আয়না।

আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না জুপ। নিশ্চয়ই ওটা সেই মেয়েটির আত্মা। চলো চলে যাই।

দাঁড়াও।

জুপিটার দ্রুত হাতে পীটের হাতটা ধরে ফেললো। তারপর বললে—শোন পীট, ওটা আপাতদৃষ্টিতে ভূত বলে মনে হলেও আসলে ভূতটুত কিছু নয়। আয়নার ওপর ছায়া পড়েছিল কোন কিছুর—

মনে হয় তাহলে আয়নার ভিতরেই সে আছে তাই না?

ঠিক তাই। সেইজন্য তো তোমাকে বললাম আর বেশী বাড়াবাড়ি না করে মিঃ হিচকক্‌কে বলে আসি এই দুর্গের কথা। দুর্গ টাতো ভুতুড়ে এই বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। তা নেই এর জন্য প্রমাণ দরকার। সবে আমরা সেই প্রমাণের কাজ শুরু করেছি। আরো অনেকটা কাজ আমাদের বাকি।

কথাটা শেষ করে বললো জুপিটার আমাদের এখন প্রথম কাজ হলো আয়নাটার গায়ে চকের চিহ্ন দিয়ে রহস্য খোঁজার কাজে হাত দেওয়া।

এবার তারা আয়নাটার দিকে এগিয়ে গেল। জুপিটার তার চক দিয়ে দাগ দিলো। তারপর আয়নাটা পরীক্ষা করতে লাগলো। কোন কিছুই তার চোখে পড়লো না! তারপর এক সময় আয়নার পিছনে এসেই সে অবাক হলো।

কি দেখছ জুপ।

একটা ছোট দরজা।

সামান্য একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। খুব অবাক হলো জুপিটার। এত তাড়াতাড়ি যে দরজাটা সামান্য ধাক্কায় খুলে যাবে ভাবেনি সে।

এবার সে দেখতে পেলো দরজার ভিতর থেকে সুড়ঙ্গের মতো একটা অন্ধকার ফালি পথ এগিয়ে গেছে।

এবার তারা সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলো। দরজায় দু'জনেই চিহ্ন দিলো। চিহ্ন দিলো সুড়ঙ্গ-দেয়ালের গায়ে। তারপর এগুতে লাগলো।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ। পাশাপাশি চলা মুস্কিল।

মনে হয় এটা কোন 'সিক্রেট প্যাসেজ'।

ঠিক তাই।

সরু দেয়াল ঘেঁষে দু'জনে এগিয়ে যাচ্ছিলো। দেয়ালের গাগুলো খড়খড়ে। চকের দাগ দিতে গিয়ে বুঝলো জুপিটার। অন্ধকার যেন আরো বাড়লো। সেই অন্ধকারের মধ্যে এবার যেন তারা শুনতে পেলো পায়ের শব্দ। কেউ যেন তাদের পিছন পিছন আসছে। চাপা সতর্কিত পায়ের শব্দ। আলো ফেললো পিছনে। কিছুই চোখে পড়লো না। এবার মনে হলো ক্ষীণ একটা শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে···একটানা সুরের শব্দ।

নীল অশরীরী আত্মা আবার তার খেলা আরম্ভ করেছে।

জুপিটার জবাব না দিয়ে দেয়ালের গায়ে কান পাতলো। তারপর বললো—আমাদের দেয়ালের পাশ থেকে শব্দটা ভেসে আসছে।

তার মানে দেয়ালের উল্টো দিকে সেই অশরীরী আছে বলতে চাও।

আমার তো তাই মনে হয়। যাইহোক পীট ভয় করলে আমাদের চলবে না।

আজ রাতের মধ্যে আমাদের সব প্রমাণ জোগাড় করতেই হবে। পারলে সেই নীল মূর্তির ইন্টারভিউও নেব।

ইন্টারভিউ নেবে। মানে তুমি কথা বলবে তার সঙ্গে।

বিস্ফারিত ভাবে কথাটা ছুঁড়ে দিলো পীট। জুপিটার বললে—তাতে ক্ষতি কি? যদি তাকে কাছে পাই এমন সুযোগ কি ছেড়ে দেব মনে করো।

পীট এবার জুপিটারের দিকে তাকালো। তারপর বললে, তোমার কি মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার মুখোমুখি পড়বো।

কিছুক্ষণের মধ্যে নয়, আমরা এক্ষুনি মুখোমুখি হয়েছি। ভাল করে তাকিয়ে দেখ।

সামনের দিকে তাকিয়ে পীটের চোখ জোড়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। মুখে কোন কথা এলো না। দেখতে পেলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে তাদের সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছে এক মায়াবী মূর্তি।

মুহূর্তে ক্যামেরার আলোটা জ্বালালো জুপিটার। সেই চকিত আলো চারদিকের অন্ধকারকে চিরে পলকের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ধোঁয়াময় হয়ে উঠলো জায়গাটা।

পীট বললে, আমি ওর মুখটা দেখেছি, ঠিক দৈত্যের মতো। ড্রাগনের চাইতেও ভয়াবহ সাংঘাতিক।

আমিও দেখেছি।

পীট যেন এবার আশ্বস্ত হলো। জুপিটার তার মুখের চেহারা লক্ষ্য করে বললো তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটা সবই আমাদের কল্পনা।

বলো কি, সত্যি দেখিনি বলতে চাও।

তা নয়। একটু হেসে বললে সে পীটের দিকে তাকিয়ে, পাহাড়ের কুয়াশার মধ্যে মাঝেমাঝে এই ধরনের কাল্পনিক চেহারার ড্রাগন বা দৈত্যদের দেখা যায়, ওগুলো আসলে ধোঁয়া ছাড়া কিছু নয়, এটাও ঠিক তাই, দেখছো না ধোঁয়াগুলো মিলিয়ে গেল।

পীটের তবু যেন বিশ্বাস হলো না। ভয় ভয় করছিল তার। জুপিটার বললে, তবে এটা ঠিক, গোটা পরিবেশটা অলৌকিক পরিবেশে এমনভাব হয়ে আছে যে ভৌতিক ব্যাপারটা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়।

ঠিক তাই। আর সেইজন্যই তো আমি তোমায় আগেই বলেছি দুর্গটা ভূতেদের আড্ডাখানা।

তা মানছি, তবে সেই ভূত কোন অশরীরী আত্মা নয়। পরিবেশটাকে ভৌতিক করে তোলার পিছনে আমার ধারণায় কোন জীবন্ত লোকের হাত আছে।

মানে তুমি কি বলতে চাও এই সমস্ত ভয়ঙ্কর অনুভূতিগুলো মানুষের তৈরি, এখানে কোন মৃত আত্মা নেই।

ঠিক তাই। একটু হেসে বললে জুপিটার ; যদি সত্যি সত্যি এইসব আত্মার কাজ হতো, তাহলে সে আমাদের ভয়ঙ্কর দুর্গে না আসার জন্য বারণ করতো না, জিপসি মহিলা, টেলিফোনে কথা বলা নিশ্চয়ই এগুলো ভূতের কারসাজি নয়!

তা নয়।

এখনো যা কিছু ঘটছে, তা কেবলমাত্র আমাদের ভয় দেখানোর জন্য, যাতে আমরা এখান থেকে চলে যাই, বাইরে গিয়ে সবাইকে বলি এই বাড়িটা ভূতের আড্ডাখানা। কেউ যেন না আসে আর।

পীট এবার বললে, যদি তোমার কথা ঠিক হয় তো তাহলে ওই লোকটা খাওয়া দাওয়া করে কি ভাবে, এখানে কাউকে দেখিনি কোনদিন।

আমারও সেই একই প্রশ্ন। ঠিক আছে চলো দেখি এগিয়ে যাই।

অন্ধকারের জটিলতা আরো বেড়ে যায় যেন। অদ্ভুত এক চাপা ফিসফিস শব্দ ছড়িয়ে যায় চারদিকে। পীট অনুভব করে অদৃশ্য ছায়া-মূর্তিটা এখনো যেন তাদের অনুসরণ করে চলেছে। জুপিটারের মধ্যে কোন বিকার নেই। ভয় পেলেও তাকে বোঝা যায় না।

একসময় তারা সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছালো। অবাক বিস্ময়ে তারা দু'জনেই অপ্রতিভ, তারযন্ত্রের বাজনার শব্দ যেন এবার আরো স্পষ্ট শুনতে পেলো তারা।

পীটের টর্চের আলোটা জ্বালিয়েই তা নিভিয়ে ফেললো জুপিটার। তারপর পকেট থেকে খড়ি চক দিয়ে দরজার গায়ে নিজেদের সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে অস্ফুট চাপা স্বরে পীটকে বললে, আমরা প্রজেকশান রুমে প্রবেশ করেছি পীট। খবরদার তুমি কিন্তু টর্চটা জ্বেলো না, নীল মায়াবী মূর্তিকে আমরা এই আঁধারে অবাক করে দিতে চাই।

এবার তারা ঘরের দেয়াল ঘেঁসে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল। পীট অনুভব করলো তার পায়ের নীচে নরম কোন ঠাণ্ডা স্পর্শের অনুভূতি। দ্রুত সে থমকে গেল। তারপর সে জায়গা বদল করে এলো জুপিটারের কাছে।

ঘরের মাঝখানে পৌঁছে এবার তারা দু'জনে গোটা ঘরটার ওপর দৃষ্টি ছড়ালো। একসময় নজরে পড়লো একেবারে কোণের দিকে নীল একটা আলোবৃত্ত জায়গা। দেখতে দেখতে ওই নীল আলোয় গোপন সে রহস্য অনুভব করলো তারা। আলোটা স্থির হয়ে আছে যেন। পীটের মনে হলো, তবে কি ওই নীল আলোর মধ্যে মায়াবী সেই নীল মূর্তির কোন রহস্য

মিশে আছে। সে পুনরায় কিছু বোঝার আগেই দেখতে পেলো জুপিটারের হাতের ক্যামেরার আলো অন্ধকার চিরে মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠলো যেন।

জুপিটার বললে, আমি ওর ছবিটা তুলে নিয়েছি। পীট জবাব দিলো না। তারমধ্যে বিস্ময়ের ঘোর তখন জমাট বেঁধেছিল। ভাবতে গিয়ে সব কিছু তার গুলিয়ে যায়। জুপিটারকে বললে ফিসফিস করে, একটা কাজ করলে হয় না জুপ।

কি কাজ?

যদি তোমার মনে হয় সে ওই আলোটার কাছাকাছি কোথাও আছে, তাহলে আমরা তো তাকে ডেকে বলতে পারি, আমরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। সেও তাহলে বুঝতে পারে আমাদের অভিপ্রায়।

পীটের কথায় উৎসাহী হয়ে জুপিটার বললে, কথাটা একেবারে মন্দ বলো নি, ঠিক আছে চলো আরো কিছুটা আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে যাই, তারপর আমি ওকে ডাকছি।

এবার তারা আরো খানিক এগিয়ে গেল রহস্যময় নীল আলো লক্ষ্য করে। তারপর শোনা গেল জুপিটারের কণ্ঠস্বর, মিষ্টার টেরিল, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমরা আপনার বন্ধু। আপনি আমাদের কথা শুনুন দয়া করে।

জুপিটারের কণ্ঠস্বর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে গেল, তারপর আবার সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢাকা বুকচাপা নির্জনতা। এবার জুপিটার চুপ করে চারদিকের ব্যাপারটা নিজের মধ্যে অনুভব করে আবার চীৎকার করে ডাকলো, মিষ্টার টেরিল, আমি জুপিটার জোন্স, আমার সঙ্গে আছে পিটার ক্রেনশো আমরা আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

মুহূর্তের মধ্যে বাজনা থেমে গেল।

জুপিটারের হাতটা শক্ত করে ধরার চেষ্টা করলো পীট। তারপরই তারা দেখতে পেলো অন্ধকারের মধ্যে রহস্যময় সেই নীল আলো যেন চলতে শুরু করেছে। ক্রমান্বয়ে উঠে যাচ্ছে ওই আলো উপরের দিকে··· একেবারে ঘরের ছাদের ওপর···জুপিটারের মনে হলো আলোটা কেউ যেন ঘরের সিলিং-এর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপরই তারা নির্জন

অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করলো বুকচাপা আর্তনাদের শব্দ···ভারি অদ্ভুত স্বরে শব্দটা ছড়িয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে।

দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়লো। তাদের মনে হলো কেউ বা কারা যেন জোর পায়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তাদের দিকে হেঁটে আসছে।

সে অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলো দুজন আরবী পোশাক পরা মানুষ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

পাঁট কিছু বোঝার আগেই টের পেলো বিরাট একটা জাল যেন তাকে জড়িয়ে ফেলছে। আচমকা ব্যাপারটা ঘটার জন্য সে ঠিক তৈরি ছিল না। টর্চটা পড়ে গেল তার হাত থেকে মাটিতে. নীচু হয়ে টর্চটা খোঁজার মতো অবসর পেলো না। জালে মাছ আটকে পড়ার মতো সে অনুভব করলো জালের মধ্যে সে নিজে জড়িয়ে গেছে। নিজেকে ছুটে বার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো পাঁট। তার আগেই কে যেন তার পা'টা টেনে ধরলো, মাটিতে পড়ে গেল সে। তারপর জড়িয়ে গেল জালের মধ্যে। অস্বাভাবিক ভয়ে পাঁট চীৎকার করে ডাকলো জুপিটারের নাম ধরে, জুপ আমাকে বাঁচাও।

কিন্তু আশ্চর্য কোন উত্তর পেলো না জুপিটারের।

মাটিতে পড়ে গিয়ে আতঙ্কিত চোখে তাকালো পাঁট। চোখে তার অন্ধকার ছাড়া কিছুই পড়লো না। কেবল দেখতে পাচ্ছিলো রহস্যময় ওই নীল আলো স্থির হয়ে আছে। তার মনে হলো ওই নীল আলো ভেদ করে নীল মায়াবী মূর্তি যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে একটি লোমশ হাত যেন তার গলাকে স্পর্শ করছে···পাঁট কথা বলতে পারে না। ভয়ে চোখ বুজে ফেললো।

একসময় জুপ অনুভব করলো তার পায়ের ওপর কেউ যেন হাত রেখেছে। চমকে তাকালো সে—কে জুপ?

চোখ খুলে চমকে উঠলো। মুখটা দেখতে পেলো অস্পষ্ট কেবল শুনতে পেলো এক মানুষের কণ্ঠস্বর—কচি ছেলে দেখছি। আশ্চর্য ছেলে তো তুমি, সবাই ভয় পেয়ে যেমন পালিয়ে যায় তেমনি তুমি পালালে না কেন—এখন দেখছি ভারি বিপদে ফেললে।

পাঁটের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। তবু সে শুকনো গলায় প্রশ্ন করলে—তুমি কে? কি চাও?

লোকটি অদ্ভুত ভাবে হাসলো। তারপর বললে, তুমি পাতালপুরীতে এসেছ বাছা—আমাদের রাজ্যে। কথাটা বললে লোকটি কাঁধের ওপর দিয়ে, পিছনের দিকে চোখ মেলে তাকালো। মনে হয় কেউ যেন এগিয়ে আসছে। সত্যিই তাই। পাঁট ভয়ার্ত চোখে তাকালো। ভারি অদ্ভুত ভাষায় তারা কথা বললো নিজেদের মধ্যে। তারপর জালে যেমন করে মাছ টেনে তোলে সেইভাবে একজন জালশুদ্ধ পাঁটকে টেনে তুললো তার পিঠের ওপর। পাঁট বেশ টের পাচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে লোকটা যেন তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। একসময় একটা ঘরে এসে পৌঁছলো। ঘরটাকে পাতালপুরীর কারাকক্ষ বলাই ভাল খুব ছোট্ট। অসম্ভব ঠাণ্ডা। আরবী পোশাক পরা লোকটিকে একজন সিঁদুরী মহিলা এবার প্রশ্ন করলে—আবদুল কোথায়?

পাঁট জালের মধ্যে জড়িয়ে থাকা অবস্থায় সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলো। লোকটি বললে সে জেনডাকে ডাকতে গেছে। এবার একজন জিপসি মেয়েকে নজরে পড়লো পাঁটের—

এবার বেঁটে আরবী লোকটি ওই জিপসি মেয়েটিকে বললে; এক কাজ করো, ঘরের তালাটা লাগিয়ে দাও, বাইরে থেকে তাহলে ওদের কেউ দেখতে পাবে না।

মেয়ে বললো নি ঠিক আছে তুমি যাও আমি ব্যবস্থা করছি।

তুমিও চলো। ওদের দুটোকে যে ভাবে বেঁধে রেখেছি তাতে ওদের জাল ছিঁড়ে পালানো মুশকিল। এখন ওরা বরং কিছুক্ষণ একা থাকুক।

কথাটা বলে দুজনেই চলে গেল।

নীরব—নির্জনতা। পাঁট কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না।

একসময় নির্জনতা ভেঙ্গে পাঁট শুনতে পেলো জুপিটারের ক্ষীণস্বর: পাঁট, তুমি ঠিক আছ তো।

চমকে উঠলো পাঁট জুপিটারের কণ্ঠস্বর শুনে।

আমি সুস্থ আছি। আমার খুব লাগেনি কোথাও। খুব বিপদে

পড়তে হলো। কথাটা বলে জুপিটার বললে, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে, বলতো আমি জালটা সেই মতো কেটে দিই।

পারবে?

জুপিটার তার ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে ছুরিটা বার করলো। তারপর পাঁটের পছন্দ মতো জায়গা দিয়ে কেটে দিলো জালের খানিকটা অংশ।

ছোট ছুরিটা দিয়ে কাটতে কষ্ট হলেও শেষ অবধি সমর্থ হলো জুপিটার। এবার নিজের হাত দুটো জাল থেকে মুক্ত করে নিয়ে পাঁট নিজের হাতে জালের বেশ খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেললো। হয়ত জালটা পুরোপুরি ছিঁড়ে ফেলতে পারতো, কিন্তু তার আগেই তারা শুনতে পেলো পায়ের শব্দ। কেউ যেন আসছে। এক সময় তারা দেখতে পেলো তাদের অনুমান সঠিক। জিপসী মেয়েটা। এগিয়ে গেল ছোট টেবিলটার দিকে—জালমুক্ত জুপিটারের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো সে, তারপর তাকালো পাঁটের দিকে। দুজনকেই জাল ছিঁড়ে ফেলতে দেখে অবাক হয়ে বললে—আশ্চর্য খুদে শয়তানতো সব—দাঁড়াও দেখাচ্ছি এবার।

এবার সে দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে কাকে যেন ডাকলো। খানিক সময়ের মধ্যে বিভূষা সেই মহিলা এগিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ আগে একেই তারা দেখেছিলো।

জেলডা এক কাজ করতো, মোটা দড়ি নিয়ে এসো। পাখি দুটো ওড়ার চেষ্টা করছিল। ধরে ফেলেছি।

তাই নাকি। দড়ি নিয়ে ফিরে এলো জেলডা। এবার তারা দুজনে মিলে জুপিটার ও পাঁটকে ভাল করে টেবিলের সঙ্গে বেঁধে ফেললো। জুপিটারের হাত দুটো পিছন দিকে বাঁধল। তারপর দুজনে চলে গেল।

এদিকে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেল। জুপিটার ও পাঁটের জন্য অস্বস্তি বোধ করলো বব আর ওয়াদিটন। আর কতক্ষণ তারা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। মনে হয় ওদের কোন বিপদ হয়েছে। বিপদ না হলে এতটা সময় নেওয়া উচিত নয়। এতক্ষণে তাদের ফিরে আসা উচিত

ছিল। শেষে ববের আপত্তি সত্ত্বেও ওয়াদিটন তাকে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে চললে ভয়ঙ্কর দুর্গের দিকে—সঙ্গীদের সন্ধানে।

ওয়াদিটনের লম্বা চওড়া চেহারার পাশে ববকে খুব ছোট দেখাচ্ছিল। মনে মনে ভয় পেলেও, আবার ভাবলো ওয়াদিটন তার সঙ্গে যখন আছে, তখন ভয়ের হেতু নেই। লোকটা সাহসী, বুদ্ধিতেও তার তুলনায় পটু। অন্ধকারে তারা এগিয়ে গেল ভয়ঙ্কর দুর্গের দিকে। অন্ধকারে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল বব। সার সার দরজা···কোন দরজা দিয়ে যে তারা ভিতরে প্রবেশ করবে ঠিক বুঝতে পারছিলো না। তাদের কাছে কোন টর্চও নেই। তবু ওয়াদিটন সাধ্যমতো সঠিক দরজাটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করলো দেশলাই জ্বালিয়ে। একসময় তারা দেখতে পেলো একটা দরজার ওপর চকখড়ি দিয়ে আঁকা—? চিহ্ন। চিহ্নটা লক্ষ্য করেই ওয়াদিটন বললে—সাদাখড়ির দাগ, মনে হয় এই দাগ মাষ্টার জুপিটারের দেওয়া।

বব লক্ষ্য করলো চিহ্নটাকে। ঘরের আর কোথাও তারা কিছুই দেখতে পেলো না। ওয়াদিটন বললে ববকে—ঘরটা কি আশ্চর্য ধরনের দেখছ? কতগুলো দরজা। আর প্রতিটি দরজার মধ্যে যেন একটা রহস্য আছে। কিন্তু ওরা ঘরের বাইরে গেল কোন দরজা দিয়ে।

কোন দরজার ওপর আর চিহ্ন খুঁজে পেলো না। এবার বব বললে—আয়নার পিছনটা একবার দেখলে হয়। মনে হয় আয়নার পিছনে যে ফ্রেমটা আছে তারমধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে।

চলো দেখি একবার।

এবার তারা আয়নাটা ভালভাবে পরীক্ষা করে চমকে উঠলো।

অনুমান ঠিকই—ছোট্ট একটা দরজা তারা দেখতে পেলো। দরজাটা খোলা।

দরজার ওপর খড়িচক দিয়ে আঁকা জুপিটারের চিহ্ন।

ওয়াদিটন সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে খুশী হলো। বললে, সত্যি মাষ্টার জুপিটারের বুদ্ধি আছে। সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার না করলে, কিছুতেই আমরা এই অন্ধকারে পথ খুঁজে পেতাম না।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তারা হাঁটা শুরু করলো। সুড়ঙ্গ পথ। এই পথ ধরে একসময় তারা এসে পৌঁছলো একটা দরজার সামনে। আবার দেখতে পেলো সাংকেতিক চিহ্ন। এবার তারা ভিতরে ঢুকলো। নিরন্ধ্র অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ে না। একসময় বব পা বাড়াতেই কিছুতে যেন ঠোকর খেলো। নীচু হয়ে সে দেখতে পেলো একটা টর্চ পড়ে আছে। টর্চটা হাতে তুলে নিয়ে জ্বালালো বব। তারপর ওয়াদিটনকে বললে—পীটের টর্চ।

ওয়াদিটন বললে—তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানেই ওরা এসেছিল—আর কিছু একটা এখানেই ঘটেছে।

এরপর তারা ঘরের চারদিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। কোন চিহ্ন চোখে পড়লো না।

এবার তারা ঘরের অন্যদিকে এসে দাঁড়ালো। দেখতে পেলো সাদা পর্দার পিছনে ছোট একটা দরজা। ওয়াদিটন লক্ষ্য করলো দেয়ালের অনেক উঁচুতে খড়ির চিহ্ন। তবে কিছুটা এলোমেলো। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে চমকালো সে।

বব তার দিকে তাকালো। বললে: কি ভাবছ?

ভাবছি, মাষ্টার জুপিটার আর পীটকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে কিনা সেই কথা।

তোমার কি তাই মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ। অন্ততঃ দেয়ালে সাদা খড়ির এলোমেলো দাগগুলো দেখে তাই মনে হচ্ছে আমার। মনে হয় কেউ তাকে কাঁধে তুলে ধরে নিয়ে গেছে এই পথ দিয়ে। তা না হলে সাদা খড়ির ওই দাগ দেয়ালের এত উঁচুতে এলো কি করে—এত উঁচুতে তো মাষ্টার জুপিটারের হাত যাওয়ার কথা নয়।

বব বুঝতে পারলো ব্যাপারটা, বললে, তাহলে কি করবে ঠিক করলে এখন।

খুঁজে বার করতে হবে ওদের।

কথাটা বলে ওয়াদিটন এগিয়ে গেল। বব তার হাত ছাড়লো না।

এবার তারা দেখতে পেলো সামনে পাথরের ছোট ছোট সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। ওয়াঁদিটন নেমে গেল ওই সিঁড়ি ধরে।

ববের কাছে ব্যাপারটা ভয়ের হলেও সে আপত্তি করতে পারলো না। নিঃশব্দে সে ওয়াঁদিটনকে অনুসরণ করলো।

চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকারে তারা পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করতে পাচ্ছিলো না। তাদের মনে হচ্ছিলো এই অন্ধকারের মধ্যে বাতাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। নির্জন নিস্তব্ধতাই দু'জনেই বিব্রতবোধ করতে লাগলো। খানিক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো ওয়াঁদিটন। কিছু যেন তার নজরে পড়ছে! এবার তারা দু'জনেই সহসা দেখতে পেলো ওই অন্ধকারের মধ্যে একটা আলো যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। ববকে নিয়ে দ্রুত দেয়ালের গা ঘেঁসে সরে দাঁড়ালো ওয়াঁদিটন। খানিক বাদে তারা স্পষ্ট দেখতে পেলো একজন মহিলাকে। মহিলাটি হাতে একটা বাতিদানি নিয়ে এগিয়ে আসছে। পাথরের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা ববের মধ্যে অদ্ভুত একটা শিহরণ চলাচল কাঁপন। ওয়াঁদিটন তার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। কথা নেই কারো মুখে। মহিলা দেখতে দেখতে তাদের কাছাকাছি হলেন। বুকের ভিতর রক্ত চলাৎ করে উঠলো ববের। মুখটা শুকিয়ে গেল। মহিলা আলো হাতে এবার তাদের ডানদিকের সরু কালি পথটা ধরে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ যে আলো ছিল, তা সরে আবার অন্ধকার নেমে এলো তাদের সামনে। ওয়াঁদিটন বললে চাপা স্বরে ববকে, চলো আমরা ওকে অনুসরণ করি। এবার তারা অন্ধকারের মধ্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে লাগলো। খানিকটা যাওয়ার পর তারা আর সেই আলো দেখতে পেলো না। একবারে শেষ মাথায় পৌঁছে তারা দেখতে পেলো, গিরিখাদের একবারে ঢালু অংশে তারা এসে পড়েছে। সামনে সরু একটা ট্যানেল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না ট্যানেলটা কতদূর গিয়েছে। মনে হয় খাদের ভিতর দিয়ে এই সরু ট্যানেলটা চলে গেছে অনেকদূর পর্যন্ত। ওদিকে আর পা বাড়ানো নিরাপদ বলে মনে হলো না ববের। তবু ওয়াঁদিটন আরো দু-এক পা এগিয়ে গেল। সহসা ববের মনে হলো তাদের দু'জনের

মাঝখান দিয়ে কিছু যেন একটা উড়ে গেল। মনে হয় কোন পতঙ্গ, পাখির মতো ডানা আছে বলে মনে হলো, পাখনার ঝাপটা পরিষ্কার টের পেয়েছে বব। চমকে উঠলো সে। পিছন থেকে টেনে ধরলো ওয়াদিটনের হাতটা। বললে ভয়ার্ত গলায়, মনে হয় বাদুড় উড়ে গেল।

বাদুড় নয়, মনে হয় রক্তচোষা পাখি।

এবার ববের কথায় হাসলো ওয়াদিটন। উড়ে যাওয়া প্রাণীটাকে লক্ষ্য করতে করতে বললে, ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল পাখিগুলো, তুমি হয়তো লক্ষ্য করোনি, এগুলো লম্বা লেজের টিয়াপাখি। পাহাড়ি গিরিখাদের আড়ালে এই পাখির বাস। কথাটা বলে ওয়াদিটন ববকে বললো, চলো এখানে মনে হয় তাদের খুঁজে পাব না। এবার আমরা মহিলা যে দিক দিয়ে এসেছেন সেই দিকটা একবার দেখি।

আবার তারা এগুতে লাগলো। এক সময় তারা শুনতে পেলো বুকচাপা আর্তনাদ।

জুপিটার নয় তো!

কান খাড়া করে গোঙানীর শব্দটা শুনলো ওয়াদিটন। তারপর বললে, চলো শব্দটা লক্ষ্য করে এগিয়ে যাই আমরা।

বুকচাপা আর্তনাদ লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো দু'জনে। খানিকটা এগুবার পর ওই শব্দ আরো পরিষ্কার হলো। এবার তাদের নজরে পড়লো ছোট্ট একটা দরজা। দরজাটার ওপরে কোন ক্রশমার্ক তারা দেখতে পেলো না। তবু মনে হলো শব্দটা যেন এই ঘর দিয়েই আসছে। দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো তারা পারলো না। কেউ যেন তালা বন্ধ করে দিয়েছে! দরজাটা ফাঁক করে চোখ রাখলো ওয়াদিটন। মনে হলো এই ঘরে কেউ যেন গোঙাচ্ছে। ববকে টর্চটা জ্বালতে বললো ওয়াদিটন। টর্চের আলো পড়তেই ভিতরের বন্দী দুই গোয়েন্দাকে নজরে পড়লো ওয়াদিটনের। চাপা স্বরে ডাকলো, মাষ্টার জুপ।

কে ওয়াদিটন?

হ্যাঁ।

পিছনের জানলা দিয়ে ভিতরে এসো; টপকে আসতে পারবে।

এবার তারা কালবিলম্ব না করে অন্ধকার ছোট ঘরের সেই এক ফালি জানলাটা খুঁজে বার করলো। পাল্লাহীন একটা ফোকর বলাই ভাল। ববকে তুলে দিয়ে নিজে ভিতরে ঢুকলো ওয়াঁদিটন। ওদের দেখে এবার স্বস্তি পেলো জুপিটার আর পীট। দ্রুত হাতে ওদের দড়িগুলো কেটে দিলো ওয়াঁদিটন। পীট বললো, এখুনি আমাদের এখান থেকে পালানো দরকার। লোকগুলো খুব বাজে ধরনের।

পীটের কথায় বব বললে, তোমরা তো লোকের কথা বলছ, আমার তো মনে হয়, এখানকার সবকিছু মারাত্মক ধরনের, এমনকি পাখিগুলো পর্যন্ত! আর একটু হলে আমাদের তো শেষ করে দিতো।

কি পাখি?

আমার তো মনে হয় রক্তচোষা। তবে ওয়াঁদিটন বললো পাখিগুলি নাকি বড় লেজওয়ালা টিয়াপাখি। কথাটা শোনামাত্র জুপিটার যেন লাফিয়ে উঠলো। বললে, তুমি ঠিক বলছ, পাখিগুলো বড় লেজওয়ালা টিয়াপাখি।

চলো, এখুনি আমাদের সেখানে যেতে হবে।

কোথায়?

মিষ্টার রেক্স'এর বাংলোয়।

সবাই অবাক। প্রশ্ন করলো সকলে একসঙ্গে, কেন?

সময় মতো বুঝতে পারবে।

কিন্তু রেক্সের সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর দুর্গ রহস্যের সম্পর্ক কি জুপ।

আছে সময় মতো নিশ্চয়ই টের পাবে।

অসময়ে দরজা খুলে গোয়েন্দা তিনজনসহ ওয়াঁদিটনকে দেখে অবাক হলেন মিষ্টার রেক্স।

মুখ চোখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কি ব্যাপার, তোমরা?

জরুরী কাজে বাধ্য হয়ে আমাদের আসতে হলো মিষ্টার রেক্স।

দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাদের বসালেন মিষ্টার রেক্স। তারা

ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো আর একজন মানুষকে। ভদ্রলোক ঘরের কোণে ছোট একটা টেবিলে বসে একা একা তাস নিয়ে খেলছেন। তারা প্রবেশ করা মাত্র তাকালেন তিনি তাদের দিকে। মিষ্টার রেক্স বললেন পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বন্ধু চার্লস গ্রাও। তারপর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রেক্স বললেন, চার্লস এরা হচ্ছে সকলেই একেকজন গোয়েন্দা, ভয়ঙ্কর দুর্গ রহস্যের তদন্ত করছে। একটু থেমে রেক্স বললেন জুপিটারের দিকে তাকিয়ে, ওহে খুদে গোয়েন্দা, কিছু রহস্য টের পেলে ? মনে হয় ভূতটুত নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছ তোমরা ?

হ্যাঁ ভূতের সন্ধান আমরা পেয়েছি। জুপিটার বললে কথাটা।

কি রকম ?

দু'জন ভূত এই দুর্গের ভয়ঙ্কর রহস্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে, আর তাদের দেখতে ঠিক আপনাদের মতো।

আমাদের মতো ! কি আবোল তাবোল বকছো।

ঠিকই বলছি মিষ্টার রেক্স। খানিক আগে আপনি আর আপনার এই বন্ধুটি আমাদের এই দুর্গের একটা গোপন কারাকক্ষে বন্ধ করে রেখে এসেছিলেন। আপনার এই অভিপ্রায়ের কারণ জানতে পারি কি ?

আমরা ! কোন প্রমাণ দিতে পার।

নিশ্চয়ই। কথাটা বলে জুপিটার স্মার্ট চোখে তাকালো রেক্সের দিকে। তারপর বললে, আপনাদের পায়ের জুতো লক্ষ্য করলেই টের পাবেন। এই জুতোতে আমাদের চিহ্ন দেওয়া আছে। আর এই চিহ্ন আমার নিজের হাতে দেওয়া।

জুপিটারের কথায় ঘরের মধ্যে যেন একটা মৃদু ঝড় বয়ে গেল। সকলেই তাকালো যে যার মুখের দিকে। অবাক বিস্ময়ে রেক্স ও চার্লস দেখতে পেলেন তাদের জুতোর ওপর সাদা খড়ি দিয়ে প্রশ্ন-চিহ্ন আঁকা।

অপ্রতিভ রেক্স আর কোন জবাব দিতে পারলেন না। কি জবাব দেবেন তিনি। তিনি যে ধরা পড়ে গেছেন। ব্যাপারটা পীটের কাছেও বিস্ময় বলে মনে হলো। সে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললে—জুপ

আমাদের যারা বন্দী করে রেখেছিল—তারা তো পাঁচজনের একটা দল। দু'জন আরবী পোশাক পরা পুরুষ, আর তিনজন মহিলা ছিলেন।

ঠিকই—আর এই পাঁচজনই হলেন ভিন্ন পোশাকে এই দু'জন মানুষ।

ঠিক তাই। তবে আমরা কেউই খুনী-ডাকাত নই। আমরা আসলে এই ভয়ঙ্কর দুর্গের ভূত—

কথাটা বলে চার্লস হাসলেন জুপিটার ও তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে।

এবার রেক্স বললেন ঠাণ্ডা গলায়—আমি কিন্তু সত্যিকার একজন খুনে—খুনও করেছি একজনকে—সে হলো মিষ্টার স্টিপেন টেরিল।

চার্লস হাসলেন। বললেন—ঠিক কথা। তুমি একজন খুনীই বটে।

রেক্স বা চার্লসের ভনিতা মাখা কথা যেন ভাল লাগলো না ওয়াদিংটনের। সে যে এখনো ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত তা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল। বললে চার্লস ও রেক্সের দিকে তাকিয়ে—পুলিশ কিন্তু আপনাদের ছেড়ে দেবে না! কাজটা খুব অপরাধজনক। চলো জুপ, আমরা বরং ব্যাপারটা তাদের কাছে গিয়ে বলি।

কথাটা বলে ওয়াশিংটন বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়ালো। পিছন থেকে তার হাতটা টেনে ধরলেন রেক্স। বললেন, শান্ত গম্ভীর স্বরে—দাঁড়াও। আমাকে আর একটু সময় দাও। এখনো আমার অনেক কথা বলার আছে। একটু থেমে বললেন।

আমি বরং স্টিপেন টেরিলকে তোমার কাছে কথা বলার জন্য নিয়ে আসছি।

আমাদের কাছে তাকে নিয়ে আসছেন মানে, তিনি তো মৃত! তবে কি বলতে চান, তার আত্মার সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে।

পীট বেশ অবাক হয়েই ছুঁড়ে দিলো কথাটা।

ঠিক তাই। তোমরা তার আত্মার সঙ্গেই কথা বলবে। তার কাছ থেকেই জানতে পারবে আমি তাকে কেন খুন করেছি।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে রেক্স ফিরে এলেন। এবার তাকে দেখে সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ বলে মনে হলো। কিছুতেই তাকে সেই 'দ্য ডাইসপ্যারার' বলে মনে হলো না। মানুষটাকে মনে হলো অপেক্ষাকৃত বেঁটে, যৌবনে পরিপূর্ণ। মাথায় বাদামি রঙের ছোট ছোট চুল। পরণে

একটা জ্যাকেট। সারা মুখে প্রচ্ছন্ন স্মিত হাসি ছড়িয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই তিনি এবার বললেন—গুড ইভনিং—আমি হচ্ছি মিষ্টার স্টিপেন টেরিল। তোমরা আমাকেই দেখতে চাও তো?

এবার উপস্থিত সকলে তাকালো জুপিটারের দিকে। কি বলে সে। উত্তর যেন তারি দেওয়ার কথা। জুপিটার সঙ্গীদের ভাব দেখে নিজেকে গুছিয়ে নিলো। তারপর বললে—মিষ্টার টেরিল, আশা করি আপনি ও মিষ্টার রেক্স অর্থাৎ 'দ্য উইসপ্যারার' একই লোক—তাই নয় কি?

কি করে, 'দ্য উইসপ্যারার' তো মাথায় বেশ খানিকটা লম্বা। তাছাড়া তার মাথায় কোন চুল নেই।

জুপিটার এবার যেন অপ্রতিভ হয়ে উঠলো। পীট, বব—সকলেই অবাক। আর তারি মধ্যে হঠাৎ করে সকলে দেখতে পেলো মিষ্টার টেরিলের খাটো শরীরটা ফুলে উঠলো। খসে গেল মাথা থেকে বাদামি চুলগুলো। হঠাৎ করে ঘটনাটা ঘটায় বেশ ভয় পেয়ে গেল গোয়েন্দারা। বিশেষ করে পীট ও 'বব রীতিমতো ছিটকে চলে গেল দরজার কাছে। কঠিন গলায় লোকটি এবার বললে, খবরদার একপা এগিয়েছ কি মৃত্যু অবধারিত। জীবনের মায়া থাকে তো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

ওরা দাঁড়িয়ে গেল। এবার তারা দেখতে পেলো তাদের সামনে মিষ্টার স্টিপেন টেরিল নেই, তার বদলে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন 'দ্য উইসপ্যারার'। এবার তিনি তার পকেট থেকে প্লাসটিকের তৈরি অদ্ভুত এক জিনিস বার করে আটকে দিলেন গলার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে দেখে মনে হলো গলায় ভর্তি লাগছে না। এবার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এই বস্তুটা আমার গলার সঙ্গে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি 'দ্য উইসপ্যারার' হয়ে যাই! কণ্ঠস্বর বদলে যায় আমার। একটু থেমে স্টিপেন টেরিল বললেন, আমার সমস্ত ঘটনা, নিশ্চয়ই জান ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে আমি ওই দুর্গ নির্মাণ করেছিলাম। পরে ব্যাঙ্ক ওই দুর্গটা নিতে চায়। আমি ততোদিনে ব্ল্যাক ক্যানিয়ান থেকে একটা গোপন ট্যানেল কেটে রাস্তা তৈরি করলাম এই উইভিং ভ্যালি রোডের এই বাড়িটা পর্যন্ত। এখানে আমি আগেই এই বাংলো তৈরি করেছিলাম

আর বাস করতাম জোনাথন রেক্স নামে। পরে এই বাড়ির মধ্যে দিয়েই যোগাযোগ করি। ট্যানেলের কাজ শেষ হলে আমার মাথার মধ্যে একটা নতুন পরিকল্পনা আসে। আর সেই পরিকল্পনা মতো আমি ওই দুর্গে একদিন একটা চিরকুট লিখে সোজা বেরিয়ে পড়ি গাড়ি নিয়ে।

এবার জুপিটার প্রশ্ন করলো, গাড়ি সেদিন আপনি নিজেই চালিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ। সেদিনটা ছিল ঝড়জলের রাত। আমি দেখলাম এমনি একটা দিনই দুর্ঘটনা ঘটানোর পক্ষে উপযুক্ত। তাই সে মতো দুর্গের লাইব্রেরী রুমে বসে ছোট একটা চিরকুট লিখলাম। চিরকুটে লিখলাম, 'আমি মিষ্টার স্টিপেন টেরিল, পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। হয়তো আমাকে আর কেউ কোনদিন দেখতে পাবে না।'

চিরকুটটা লিখে আমি বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। তারপর একটা নির্জন খাদের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে থেমে পরে আমি গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিলাম। পরের দিন সকালে সবাই দেখলো ব্যাপারটা, ধরে নিলো আমি মারা গেছি।

সেইদিন থেকেই ওই দুর্গ এখনো খালি পড়ে আছে। কেউ ওর মধ্যে প্রবেশ করে বাস করতে পারে না। আমি দুর্গে এখনো বাস করি। এখানকার ওই গোপন ট্যানেলের পথ দিয়েই যাতায়াত করি আমি। প্রথম আমি ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা শুরু করি পুলিশের তদন্তের সময়। তারা দুর্গের আতঙ্কিত পরিবেশ দেখে ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি তদন্ত বন্ধ করে। বাড়িটাকে ভুতুড়ে বলে প্রচার করে। বাড়িটা এমনভাবে তৈরি করা, সবাই একে এমনিতেই ভুতুড়ে ভাবতো। পরে এখানকার কার্যকলাপে এই দুর্গের ভুতুড়ে ব্যাপারটা জনশ্রুতির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল শহরের চারদিকে। এইভাবে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর আমি মিষ্টার রেক্স হিসাবে পাখির ব্যবসা করে টাকা জমাই এবং ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বাড়িটাকে কিনে নিই। বহুদিন তারপর আর কেউ এখানে আসেনি, এই তোমরাই এলে, অনেকদিন পর।

কথাটা বলে মিষ্টার টেরিল হাসলেন। তারপর বললেন জুপিটার

ও তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে, আর যে ছবিটা দেখলে, ওটা সম্পূর্ণ ফটোগ্রাফির কাজ। একটু হেসে বললেন, আর কিছু জানার আছে তোমাদের ?

হ্যাঁ মিষ্টার টেরিল, আমাকে কি আপনি বাড়িতে ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ। তোমাকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলাম যাতে তুমি ভয় পাও।

আর জিপসী মেয়ে হিসাবে যে গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে, সেও নিশ্চয়ই আপনি ?

ঠিক তাই। চার্লস আমাকে ওই পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছিল।

এবার পীট বললে, আমাদের ওপর সেদিন ওভাবে পাথরটা গড়িয়ে দিয়েছিলেন কি আপনি ?

না, সে কাজ টেরিলের নয়, আমি করেছি।

এবার কথাটা বললেন চার্লস। তারপর তিনি পীটের দিকে তাকিয়ে, আমি দুঃখিত। ওভাবে পাথর গড়িয়ে না দিলে সেদিন আমি প্রায় ধরা পড়ে যেতাম তোমাদের কাছে।

কি রকম।

জুপিটার জানতে চাইলো। চার্লস বললেন, খানিক আগে তোমাদের মতো একটা ছেলে এসেছিল। প্রথমটায় ভেবেছিলাম হয়তো তোমরাই। পরে দেখতে পেলাম তোমাদের রোলস রয়েস ছুটে আসছে, সেই দেখেই আমি মিষ্টার টেরিলকে কিছুটা সতর্ক করে দিতে যাই। আসলে তোমাদের কিছুটা সময় নষ্ট করিয়ে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নয়।

মিষ্টার চার্লস থামতেই মিষ্টার টেরিল বললেন, মিষ্টার চার্লস এই ব্ল্যাক ক্যানিয়ানের একটা নির্জন জায়গায় থাকেন। তার বাড়ি থেকে পাহাড়ি রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। নতুন কোন লোক এদিকে এলেই চার্লস আমাকে টেলিফোনে সতর্ক করে দেয়। আমিও সেই মতো সতর্ক হয়ে যাই। তারপর পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু করি দুর্গটাকে ভয়ঙ্কর করে তুলতে। একটু থেমে টেরিল বললেন, আমার তৈরি ভূতেরা কারুর ক্ষতি করে না কখনও। তারা কেবল ভয় দেখিয়ে সতর্ক করে দিতে চায়,

যেন ওই দুর্গের মধ্যে কেউ না প্রবেশ করে। আচ্ছা এবার বলতো, তুমি কি করে সন্দেহ করলে, এই দুর্গের মধ্যে কোন ভূত নেই—সবই মানুষ ভূতের কারসাজি।

জুপিটার এবার বিজ্ঞের মতো তাকালো টেরিলের দিকে। তারপর বললে, মিষ্টার টেরিল, ভূতেরা কখনও কোন মানুষকে কোন ব্যাপার থেকে বিরত করার জন্য বারবার ওভাবে সাবধান করে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের বারবার সাবধান করা হয়েছে, যেমন প্রথমে টেলিফোনে ও পরে জিপসী মহিলা সেজে নিষেধ করে আসা। বিশেষ করে জিপসী মহিলা সেজে আমাকে সাবধান করে আসার পরেই আমার মধ্যে প্রথম ব্যাপারটায় খটকা লাগে। আমি বেশ পরিষ্কার বুঝলাম—আমাদের কাজে যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, সে আসলে কোন ভূত নয়। এ মানুষেরই কাজ—যার সঙ্গে এই ক্যাসেলের গভীর সম্পর্ক আছে। আর তাতেই আমার মনে হলো আপনি জীবিত।

চমৎকার বিশ্লেষণ। আমিও আন্দাজ করেছিলাম ব্যাপারটা তুমি হয়তো বুঝলেও বুঝতে পারবে। এ ছাড়া আর কিছু কি সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে তোমার?

হ্যাঁ, ববের তোলা ছবিগুলো আমাকে রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে অনেকখানি। বিশেষ করে ওর তোলা ছবি দেখে মনে হলো সে বর্মটা পরে সেদিন ওকে যেই ভয় দেখিয়ে থাকুক না কেন—সেটা খুব একটা পুরনো নয়। ছবিতেই বেশ চকচকে বলে মনে হয়েছিল আমার ওই বর্ম পোশাকটা। তাছাড়া লাইব্রেরী রুম দেখে মনে হলো খুবই গোছানো। পুরনো বাড়ির লাইব্রেরী হলে বইগুলোর যে অবস্থায় থাকা উচিত, তার তুলনায় বইগুলো বেশ যত্নেই আছে—এর ফলে আমি ধরে নিলাম নিশ্চয়ই এই লাইব্রেরী রুমটাকে কেউ না কেউ প্রতিদিন দেখাশোনা করে। আর তা থেকেই আমার বিশ্বাস হলো এই ভয়ঙ্কর দুর্গের পিছনে নিশ্চয়ই কোন লোকের চাতুরি আছে। তাছাড়া আর একটা বড় সন্দেহ ছিল আমার মিষ্টার রেক্স এই বাড়িতে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলার সময়। তাহলো যখন আপনি চোখের কালো চশমাটা ব্যবহার করেছিলেন।

এবার আমাকে একটা কথা বলুন তো দুর্গের মধ্যে সুরতরঙ্গ কিভাবে আপনি ব্যবহার করেন ?

তোমার কি মনে হয়।

আমার ধারণায় একটা বড় ধরনের কোন পাইপ অরগ্যানের মাধ্যমে আপনি করতেন। তাছাড়া দেয়ালের মধ্যে মনে হয় লাউড স্পীকার বসানো আছে, যা থেকে দুর্গের চারদিকে অস্পষ্টভাবে কুহেলিকার মতো ওই শব্দ শোনা যায়, আর মূল পাইপ অরগ্যানটা প্রজেক্‌শান রুমের পিছনের দিক ঘেসে নেমে গেছে ট্যানেলের দিকে, তাই না ?

ঠিক তাই।

আর ওই ছবির চোখটা ? এবার প্রশ্ন করলো পীট !

মিষ্টার টেরিল তাকালেন তার দিকে। তারপর বললেন—

ওটা সেদিন তোমরা যা দেখেছিলে তা আমারি চোখ। ওই ছবির পিছনে একটা ছোট্ট প্যাসেজ আছে। আমি ওই প্যাসেজে চোখ রেখে তোমাদের লক্ষ্য করেছি। চোখটা আসলে ছবিতে একটা ফাঁকা গর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু আমার যতদূর মনে আছে মিষ্টার টেরিল ছবির ওই চোখে আমি কোন গর্ত দেখিনি। পীট তাই না ?

পীট বেশ দৃঢ় গলায় বললে কথাটা।

মিষ্টার টেরিল তার দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রথম দিন আমার চোখের ওপর হাত দিয়ে যখন তুমি ভয় পেয়ে জুপকে ডাকতে গিয়েছিলে, আমি তখনই ওই ছবিটা বদলে একই ধরনের অন্য আর একটা ছবি ওখানে রেখেছিলাম, আর তারি জন্য তোমরা ওই ছবির মধ্যে চোখের গর্তটা দেখতে পাওনি।

কিন্তু ওই নাল মায়াবী মূর্তি, ওটা কি ? আর কুয়াশার তৈরি মূর্তিটাই বা কি করে হলো মিষ্টার টেরিল।

পীটের কথায় মিষ্টার টেরিলের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো এবার। বিরক্ত মাখা গলায় বললেন—আর আমি তোমাদের কোন কথা বলতে নারাজ। একটু থেমে বললেন কণ্ঠস্বরকে নামিয়ে নিয়ে ; গোটা ব্যাপারটাই একটা

ম্যাজিক। কোন ম্যাজিসিয়ান কি তার গোপন চাবিকাঠির কথা কাউকে ফাঁস করে? না তার কাছ থেকে জানতে চাওয়াটা উচিত। যা রহস্য তা রহস্যই থাক, জানতে চেওনা। শুধু বলতে পারি এইগুলো ম্যাজিকের সাহায্যে হয়েছে।

আমি কিন্তু আপনার এই ম্যাজিকের কৌশল টের পেয়েছি মিষ্টার টেরিল।

কথাটা আচমকা ছুঁড়ে দিয়ে তাকালো জুপিটার। তারপর বললে—দেয়ালের গায়ে মনে হয় অসংখ্য গোপন ছিদ্র আছে। ভিতর দিয়ে কোন ছোট পাইপের সাহায্যে আপনি পাম্প করে এই ব্যাপারটা ঘটিয়ে থাকেন। অন্তত আমাদের ভয় দেখানোর ব্যাপারে আপনি এই কৌশলই ব্যবহার করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস।

ঠিক তাই।

টেরিল তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর বললেন, আমি যে সেই লোক এই অনুমান করলে কি করে?

জুপিটার হেসে বললে—ব্যাপারটা আগে আমার মগজে ছিল না এটা ঠিকই। পরে যখন দেখলাম আরবী পোশাক পরার সময় আপনি যে জুতো ব্যবহার করেছেন সেই একই জুতো ব্যবহার করছেন মহিলা পোশাক পরেই, তখনই বুঝতে পারলাম গোটা ব্যাপারটার পিছনে অভিনয় দক্ষতা আছে। আপনি যে একজন এককালের ভাল অভিনেতা তাতো আমার জানা ছিল। শুনেওছি আপনি নাকি মহিলা গলায় ভাল কথা বলতে পারেন, আর সেইকথা মনে হওয়া মাত্র আমি একবারে নিশ্চিত হয়ে যাই এই কাজ মিষ্টার টেরিলের ছাড়া আর কারো নয়। আমি তখনই আপনার জুতোটা লক্ষ্য করে দাগ দিই।

তা নয় বুঝলাম, তবে আমিই যে সে তা তুমি বুঝলে কি করে।

সত্যি বলতে কি প্রথমে এটা বুঝতে পারিনি মিষ্টার রেক্স আপনি স্বয়ং। বুঝেছিলাম অনেক পরে, যখন ওয়াদিটন আর ববের কাছে শুনলাম তারা গোপন ট্যানেলের পথ একটা দেখতে পেয়েছে, আর ওই পথেই তারা আলো হাতে চলে যেতে দেখেছে একজন মহিলাকে। তখনই

বুঝলাম এই ট্যানেল পথ উইনডি ভ্যালি পর্যন্ত গিয়েছে, আর নিশ্চয়ই এই পথের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ আছে মিষ্টার রেক্স-এর বাংলোর। এরপর ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল যখন ওরা বললে; ট্যানেল পথে তারা সারিবদ্ধ কিছু বড় লেজওয়ালা টিয়া উড়ে যেতে দেখেছে—তখনই আমার মনে আপনার নামটা এলো। বুঝলাম, এটাও হয়তো একটা চূড়ান্ত অভিনয় হবে।

মিঃ টেরিল অবাক হয়ে শুনছিলেন জুপিটারের কথাগুলো। বললেন—সত্যি জুপিটার আমি তোমার প্রশংসা না করে পাচ্ছি না। এখনও পর্যন্ত মিঃ রেক্স হিসাবে আমাকে কেউ সন্দেহ করেনি—এই ব্যাপারটা একমাত্র চার্লস ছাড়া কেউ জানে না। সেই আমাকে পোশাক বদলে দেয় নিজের হাতে—কাজটা আমরা খুব দ্রুত করতে পারি। তাছাড়া তুমি হয়তো জানো না, আমরা দু'জনে মিলে বিভিন্ন পোশাকের মাধ্যমে যে কোন লোকের সামনে বিভিন্ন পোশাকের একটা মস্ত দল তৈরি করতে পারি। আরবী, ফার্সি, জার্মান, চীনা সব ভাষাতেই কথা বলতে আমরা অভ্যস্ত।

একটু থেমে এবার টেরিল তাকালেন চার্লসের দিকে। বললেন তাকে, পাখিগুলো ট্যানেলের দিকে গেল কি করে চার্লস?

খাঁচাটা মনে হয় ঠিক মতো লাগানো ছিল না।

ঠিক তাই আজ আমি পাখির খাঁচার দরজাটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এবার কথাটা শেষ করে মিঃ টেরিল হঠাৎ করে বললেন—আর কোন কথা বলতে আমি চাই না তোমাদের সঙ্গে। এরপর হয়তো তোমরা আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে। একটু থেমে তিনি বললেন—বরং এসো তোমাদের একটা মজার জিনিস দেখাই—হয়তো ব্যাপারটা দেখলে কিছুটা অনুমান করতে পারবে।

জুপিটার তাকালো তার দিকে।

ভাল করে তাকিয়ে থাক আমার দিকে।

দেখতে দেখতে ওরা দেখতে পেলো, মিঃ টেরিলের শরীরটা হঠাৎ করে

লম্বা হয়ে উঠলো। মাথা থেকে চুল সরিয়ে ফেলে বললে—এখন আমি মিঃ বেক্স—'দ্য উাইসপ্যারার।' তার পরক্ষণে তিনি চকিতে শরীরটাকে অদ্ভুত কায়দায় গুটিয়ে নিয়ে মাথায় একটা বাদামি চুলের খোলস এঁটে নিলেন। এবার তাকে আবার আগের মতো তাদের মিঃ টেরিল বলে মনে হলো।

ব্যাপারটা চোখের ওপর এমন ভাবে ঘটলো যে সকলে অবাক। কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। চোখের চাউনিতে বিস্ফারিতের চিহ্ন। এবার টেরিল এক ঝটকায় ঘরের ভিতরকার একটা দরজা খুলে ফেললেন। তারপর ওদের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

ছোট ঘরের ভিতরে ঢুকলো জুপিটার তার সঙ্গীদের নিয়ে।

টেরিল বললেন—এই হচ্ছে আমার সাজঘর—আমি মিঃ স্টিফেন টেরিল এই ঘরে বসেই পোশাক বদলাই। দেয়ালের গায়ে দেখছো তো কত সব রঙ-বেরঙের পোশাক—এগুলো সবই অভিনেতা টেরিলের। একদিন এই পোশাক পরেই তোমাদের অভিনেতা দর্শকদের শিহরিত করতো। নানা চেহারায় নিজেকে প্রকাশ করতো।

কথাগুলো বলতে বলতে টেরিলের কণ্ঠস্বর যেন ধরে এলো। একটি থেমে বললেন—আজ অনেক বছর হয়ে গেল, যখন এই দুর্গ ছিল আমার অভিনেতা জীবনের শেষ গর্ব। এই দুর্গের মধ্যে আজ আমি বাস করছি—বাস করেও চলেছি। তবে এই জীবন সম্পূর্ণ নির্বাসিত। নির্বাসিত জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি এই ঘরে বসে আজ বর্তমান কাজের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। কথা বলেছি বিভিন্ন গলায়, বিভিন্ন স্বরে। বিশ্বাস করো, আজ আমি নির্বাসিত থাকতে থাকতে বড় একা হয়ে উঠেছি। আর আমি চাই না নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতে এই সব ভৌতিক রহস্যের মধ্যে। এখন মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে সবকিছু ধূলিস্যাৎ করে আবার আগের জীবন ফিরে পেতে—সবাই জানুক আমি এখনো বেঁচে আছি। আমি চাই না নিজেকে পুনরায় 'দ্য উাইসপারার' রূপে সাজাতে কিংবা যা করছি—তা করতে। বিশ্বাস করো—আমি চাই না—চাই না এই সব কিছু!

কথাগুলো বলতে বলতে মিঃ টেরিলের কণ্ঠস্বর যেন ধরে এলো। কণ্ঠস্বর ডুবে গেল ভিজে আবেগের মধ্যে। দু'চোখ তার ঝাপসা হয়ে

গেল। মনে হলো তার যেন আরো কিছু কথা বলার আছে। বলতে পারলো না। কেবল অস্ফুট গুঞ্জনে ঠোঁট জোড়া কেঁপে উঠলো তার।

নীরব মুহূর্ত।

কারো মুখে কোন কথা নেই। এক সময় নির্জনতা চিরে শোনা গেল জুপিটারের কণ্ঠস্বর—মিঃ টেরিল।

টেরিল তাকালেন তার দিকে।

জুপিটার বললে সমবেদনা মাখা গলায়—আপনি তো—আপনি তো আপনার তোলা ছবিগুলো আবার দেখাতে পারেন মানুষকে, এই সব ছবি তো বহুদিন আগের তোলা। লোকে ভুলেও গেছে—মনে হয় ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেষ্টিং হবে।

জুপিটারের কথায় মিঃ টেরিল তাকালেন তার দিকে। আবেগের প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা তখনও যেন ঘিরে ছিল টেরিলকে। জুপিটারের কথায় তিনি কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কেবল নিঃশব্দে দোলালেন নিজের মাথাটা। তারপর খুব অস্পষ্ট স্বরে বললেন অভিনেতা টেরিল, তোমার কি তাই মনে হয়—লোকে আবার নিতে পারবে আমাকে?

নিশ্চয়ই পারবে। বরং আনন্দ পাবে—অবাক হয়ে তারা ভাববে ভয়ঙ্কর দুর্গের রহস্যের কথা। একটু থেমে জুপিটার বললে, একটা কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, একলা হাতে আপনি বিশাল এই দুর্গকে ভয়ঙ্কর করে তুললেন কি করে। সত্যি আপনার প্রতিভার তুলনাই হয় না। এই প্রতিভা মনে হয় মানুষকে আরো বেশী খুশী করতে পারবে মিঃ টেরিল।

জুপিটারের কথায় মিঃ টেরিল কোন জবাব দিলেন না। কেবল অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। দু'চোখে শূন্য উদাস দৃষ্টি।

পরের দিন সকালে রোলস রয়েস নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা।

ধীর গতিতে গাড়ি এবার এগিয়ে চললো হলিউডের দিকে।

সকালের পাহাড়ি পথ। সোনালী মুঠোমুঠো রোদ উপচে পড়ছে চারদিক। মনে হচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে যাচ্ছে স্বপ্নের মতো সোনালী তরল প্রবাহ। আর তারি মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা স্বপ্ন-

সূর্যের প্রবাহমান সোনার রোলস রয়েস। চারদিক মিলেমিশে সোনালী প্রভার দ্যুতি মহিমাময় এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে যেন।

আঁকা-বাঁকা রাস্তা ধরে রোলস রয়েস এগিয়ে যেতে থাকে। সামনে নীল আকাশ। আকাশের বুকে যেন বর্শা ফলার মতো বিঁধে আছে পাহাড়ের উন্নত শৃঙ্গরাজি—রক্তের মতো মনে হচ্ছে আকাশ চেরা অরুণ প্রভাকে দেখে। সর্পিল রাস্তা ধরে রোলস রয়েস এগিয়ে যেতে থাকে। পাহাড়ের ঘূর্ণিপথে পাহাড় যেন ক্রমান্বয়ে সরে সরে আসছে গভীর সান্নিধ্যতায়। মিশে যাচ্ছে পাহাড়ে-পাহাড়ে।

গাড়ির সামনে সোনার ষ্টিয়ারিং ধরে বসে আছে ওর্য়ার্দিটন। সামনের কাঁচের ওপর এসে পড়েছে প্রভাতকালীন সূর্যের কিরণ। মুখে তার কথা নেই। পিছনের সিটে বসে ওরা তিনজন, পাশাপাশি। জুপিটার এক ধারে বসে। তার মুখে হাসির চিহ্ন নেই। গম্ভীর। মনে হয় সে কিছু চিন্তা করছে। আত্মমগ্ন। পিছনে এক পাশে বসে পীট, তার পাশে বসে আছে বব। পীট ও বব দু'জনেই খুব উৎফুল্ল। হাজার হোক তারা এখন মিষ্টার হিচককের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। মিষ্টার হিচকক্ নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন তাদের দেখে। বিশেষ করে যখন শুনবেন, এই তিন গোয়েন্দা তার পরবর্তী ছবির জন্য হানাবাড়ি আবিষ্কার করেছে। আর এই বাড়ি তার নিজস্ব লোকালয়ের মধ্যে।

দু-একবার তারা কথা বলার চেষ্টা করলো জুপিটার'এর সঙ্গে। কিন্তু তাদের কথার কোন উত্তর দিলো না সে।

আসলে জুপিটার তখন তার নিজের মধ্যে চিন্তামগ্ন। তার বারবার মনে হচ্ছিলো মিষ্টার টেরিলের কথা। টেরিল তাকে আরো কিছু গোপন করেছে—বিশেষ করে অরগ্যানের সুর মূর্চ্ছনার কথা। সেই রহস্যকে সে যেন মনে মনে ভেদ করার চেষ্টা করছিল। সেই কারণেই তার ভাল লাগছিল না বব বা পীটের কথা।

এক সময় দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পড়লো স্টুডিও চত্বরে। দু'ধারে লম্বা পাঁচিল। বিশাল পাঁচিলের ধার ঘেসে ছুটে চলেছে রোলস রয়েস। এবার আর তাদের কেউ বাধা দিলো না।

এক বিরাট লোহার গেটের সামনে একসময় এসে দাঁড়ালো রোলস রয়েস। আজ আর তাদের প্রথম দিনের মতো কোনরকম বেগ পেতে হলো না। গেটের পাহারারত দারোয়ান তাদের দেখে দরজা খুলে দিলো। হাত নাড়লো। বোঝা গেল সোনার রোলস রয়েস চিনতে এবার তার কষ্ট হয়নি কোন।

গাড়ি এগিয়ে চললো স্টুডিওর মধ্যে দিয়ে। দু'ধারে সবুজ লন। লনের দু'দিক দিয়ে নদীর রেখার মতো চলে গেছে এঁকে-বেঁকে রঙিন পাথর কুচির সরু রাস্তা।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল রোলস রয়েস। দু'ধারে ছোট ছোট রঙিন কাঠের বাড়ি। দূর থেকে দেখে এই কাঠের ছোট বাড়িগুলোকে খেলাঘরের সাজানো সামগ্রীর মতো লাগছিল। ওয়র্দিটন জানে— হিচককের বাংলোটা কোনদিকে হবে। এর আগেও সে এসেছে। কাজেই তাকে আর এবার কিছু নতুন করে বলে দিতে হলো না জুপিটারকে।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো পরিচিত সেই বাংলোর সামনে। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করলো ওয়র্দিটন। তারপর দরজা খুলে দিলো। গাড়ি থেকে নেমে এলো জুপিটারসহ তার সঙ্গীরা। তারপর ওরা নামতেই গাড়িতে চাবি দিয়ে—ওয়র্দিটনও এবার এগিয়ে গেল তাদের সঙ্গে। সামনেই কাঁচের ঘর। ঘরের মধ্যে দেখা গেল মিষ্টার আলফ্রেড হিচককের প্রধান সচিবকে বসে থাকতে। তাদের দেখামাত্র ভদ্রলোক উঠে এলেন। দরজা খুলে বললেন —এসো তোমরা। তোমাদের জন্য মিষ্টার হিচকক্ অপেক্ষা করছেন।

তারপর কাঁচের দরজা টপকে একে একে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলো তিন গোয়েন্দাসহ ওয়র্দিটন।

খানিক সময় ব্যবধানের পর একসময় দেখা গেল মিষ্টার আলফ্রেড হিচককের পরিচিত চেহারা। ভারি জুতোর গোড়ালিতে শব্দ তুলে মানুষটা ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন তাদের দিকে। পরণে বাদামি রঙের চেক স্যুট। ঠোঁটে ঝোলানো টোবাকো পাইপ। জুতোর শব্দ শুনে ওরা তাকালো পিছন ফিরে। এসেছ তোমরা, আমি তো তোমাদের

জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। ঠোঁট থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে কথাটা বলতে বলতে মিষ্টার হিচকক্ এগিয়ে এলেন তাদের দিকে। তারপর বসলেন ওদের ঠিক মাঝখানে নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারে। সকলের ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিষ্টার আলফ্রেড হিচকক্ ছুঁড়ে দিলেন তার ত্রাস্ত প্রশ্নটি, কি ব্যাপার, তোমরা কি কোন সন্ধান পেয়েছ ?

প্রশ্নটা লুফে নিলো জুপিটার। বললো হিচককের দিকে তাকিয়ে, হ্যাঁ স্যার সন্ধান পেয়েছি।

কি রকম ?

একটা পরিত্যক্ত ভয়ঙ্কর দুর্গ।

সত্যি! সত্যি সত্যি ভূতটুত আছে নাকি সেখানে ?

আছে স্যার, জীবন্ত সব ভূতের আড্ডা।

জুপিটারের কথায় অবাক হলেন মিষ্টার আলফ্রেড হিচকক্। বিস্ফারিত চোখে জুপিটারের দিকে তাকালেন। তারপর ঠোঁট থেকে পাইপটা সরিয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা স্বর তুলে বললেন—

কি রকম শুনি।

শুনবেন স্যার। তাহলে বলি শুনুন।

কথাটা বলে জুপিটার এবার গুছিয়ে নিলো। তারপর বলতে লাগলো। গভীর মন দিয়ে মিষ্টার আলফ্রেড হিচকক্ শুনছিলেন জুপিটারের কথাগুলো। একসময় তার কথা শেষ হলে তিনি বললেন, তোমাদের মুখে মিষ্টার টেরিলের কথা শুনে খুশী হলাম। মানুষটা বেঁচে আছেন এই খবরটা সত্যি খুব সুখের। সত্যি তার মতো প্রতিভাবান অভিনেতা খুবই বিরল! কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি, তিনি ওই দুর্গকে ভয়ঙ্কর করে তুললেন কি করে, কি তার কৌশল?

জুপিটার এবার বললে, ব্যাপারটা মিষ্টার টেরিল আমাদের খোলাখুলি ভাবে কিছু বলেননি বটে, তবে আমার এই ব্যাপারে কিছু অনুমান আছে।

কি রকম ?

জুপিটার বলতে লাগলো তার অনুমানের কথাগুলো। সে অস্পষ্ট গলায় বললে, একটা ব্যাপারে আমি প্রথমটায় খুব সন্দিহান ছিলাম,

তাহলো সুরমূর্চ্ছনার ব্যাপারে। পরে আমার কাকা একটা পাইপ অরগ্যান আমাদের বাড়িতে আনার পর আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, একমাত্র পাইপ-অরগ্যানের মাধ্যমেই এই কাজ করা সম্ভব। কারণ এই পাইপ অরগ্যানের ভিতর দিয়ে শব্দকে খুশীমতো বাড়ানো কমানো যায়। মিষ্টার টেরিল তাই করতেন। মূল পাইপ-অরগ্যানের মাধ্যমে তিনি ওই সুর-মূর্চ্ছনা বাড়িয়ে কমিয়ে গোটা পরিবেশকে ভয়ার্ত করে তুলতেন।

মিষ্টার আলফ্রেড হিচকক্ মাথা দোলালেন। তারপর বললেন, কিন্তু আয়নার ওপর মেয়েটির ছায়া পড়লো কি করে, তুমি তো বললে ঘরে ওই ধরনের কোন পুতুলও তুমি দেখতে পাওনি?

তা ঠিক স্যার, আমার ধারনায় এটা খুব সহজেই মিষ্টার টেরিল করেছিলেন প্রজেক্‌শনের মাধ্যমে।

এবার মিষ্টার আলফ্রেড হিচকক্ তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর বললেন, সত্যি মাষ্টার জুপিটার তোমার মধ্যে গোয়েন্দাগিরি করার মতো চোখ আছে। সত্যি সত্যি তোমাদের তিন গোয়েন্দাকে আমার ধন্যবাদ। আমি তোমাদের কথা পৃথিবীর সকলকে জানাতে চাই। এর জন্য আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করছি।

ধন্যবাদ স্যার। এটা আপনার বদান্যতা, যদি আপনি সত্যি সত্যি আমাদের বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু করেন তো আমাদের এজেন্সির খুব সুবিধে হয়।

নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু আমার একটা কথা ছিল।

কি কথা স্যার?

আমি সত্যি সত্যি কোন ভূতের বাড়ি সময় মতো না পাওয়ায় ছবির কাজটা বানচাল করে দিয়েছি। ও ছবি এখন আর আমি করছি না। এরপর তোমরা কি করবে বলে ঠিক করেছ?

এখনও কিছু ঠিক করিনি। তবে মিষ্টার হিচকক্, আমরা হলাম গোয়েন্দা। তদন্ত করাই হলো আমাদের কাজ। কাজেই কাজ একটা কিছু জুটে যাবে। আপনি আমাদের তদন্ত করে ভৌতিক বাড়ি খুঁজে আনার কথা বলেছিলেন, আমরাও এনেছি। এখন আমাদের খোঁজ অনুসারে কাজ করা না করা আপনার অভিরুচি।

জুপিটারের কথায় হাসলেন মিষ্টার হিচকক্। তারপর বললেন, আমি যদি তোমাদের আর কোন তদন্তের দায়িত্ব দিই তা করতে কি তোমরা রাজি হবে।

নিশ্চয়ই করবো। যে কোন কাজের তদন্ত করতেই আমরা রাজি।

বেশ তাহলে একটা কাজ করো। একটু হেসে হিচকক্ বললেন, আমার একজন পুরনো পরিচিত বন্ধু আছেন। ভদ্রলোক শেক্সপীয়ান যুগের একজন বিখ্যাত অভিনেতা। কিছুদিন হলো তিনি তার প্রিয় পোষা তোতাপাখিটিকে হারিয়েছেন। এই ব্যাপারে পুলিশকে জানানো হয়েছিল, তারা কোন কিনারা করতে পারেনি। একটু থেমে হিচকক্ বললেন, যদি তোমরা এই কাজের দায়িত্বটা হাতে নাও। আমার নিজের কাজ মনে করে কাজটা করতে পারতো খুব ভাল হয়। আমার বিশ্বাস এই কাজ তোমরাই করতে পারবে। অবশ্য পাখি খোঁজার কাজ বলে তোমাদের হয়তো আপত্তি থাকতে পারে। তাই বলছিলাম।

হিচককের কথা শেষ হতে পারলো না, তার আগেই জুপিটার বললে, কাজ—কাজ, তা সে যে কাজই হোক আমরা করতে প্রস্তুত। আমরা গোয়েন্দা, গোয়েন্দাগিরি করাই হলো আমাদের কাজ। একটু থেমে বললে, মিষ্টার হিচকক্ আপনার এই কাজে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

বেশ তাহলে তোমরা কাজে লেগে যাও।

ধন্যবাদ স্যার।

জুপিটার উঠে দাঁড়ালো চেয়ার থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরা ও উঠে পড়লো।

এবার তাদের উঠে দাঁড়াতে দেখে হিচকক্ বললেন, আমার কিন্তু একটা কথা আছে।

কি কথা?

তোমরা কি জানো তোতাপাখিরা কিভাবে চীৎকার করে, শুনেছ কি কখনও ওদের ডাক?

না স্যার তবে না জানলেও আমাদের জেনে নিতে কোন অসুবিধে হবে না। একটু থেমে পীটের দিকে তাকিয়ে জুপিটার বললে, চলো পীট, আমরা দ্বিতীয় তদন্ত অভিযানের কাজ শুরু করি।

দাঁড়াও।

মিষ্টার হিচকক্ পিছন থেকে ডাকলেন জুপিটারকে। তারপর বললেন জুপিটারের দিকে তাকিয়ে, আমার কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কনডিশন আছে।

কি কনডিশেন?

আলফ্রেড হিচকক্ তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর বললেন—

তোমরা শুধু হারানো পাখিটাকেই খুঁজে বার করবে। আর সেইসঙ্গে তোমাদের দায়িত্ব হবে প্রতিদিনের কাজের হিসাবটা লিখে রাখা। জানতো, লিখে কাজ না করলে গোয়েন্দাদের কাজের ষোলকলা পূরণ হয় না।

জুপিটার তাকালো আলফ্রেড হিচককের দিকে। তারপর বললে, ধন্যবাদ স্যার।

এবার হিচকক্ তার পকেট থেকে একটা নাম লেখা আইভরি কার্ড বার করে বললেন—এই কার্ডটা তোমাদের কাছে রাখ। এতে আমার বন্ধুর নাম ঠিকানা লেখা আছে। এই নাও ধর, কার্ডটা।

জুপিটার হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলো। তারপর একঝলক কার্ডটার ওপর চোখ বুলিয়ে জুপিটার কার্ডটা রাখলো তার পকেটে। তারপর বললে—

ধন্যবাদ স্যার—সময় মতো আমরা জানাবো। এখন আমরা চলি।

কথাটা বলে জুপিটার আর দাঁড়ালো না। সঙ্গীদের নিয়ে সে হিচকক্কে বিদায় দিয়ে বেরিয়ে এলো কাচঘরের বাইরে।

স্থির চাউনি নিয়ে হিচকক্ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তার চোখের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। পাইপে টান দিতে দিতে হিচককের চোখের ওপর ভেসে এলো নতুন এক কল্পনা। ঠোঁটের কোলে ফুটে উঠলো চাপা স্মিত হাসি। মনে মনে তিনি ভাবলেন: ঠিক—এই সেই গল্প—এমনি এক গল্পের কথাই তিনি ভাবছিলেন এতদিন। ঠিক এমনি এক ভয়ঙ্কর দুর্গের গোপন রহস্যই হবে আমার আগামী ছবির গল্পের পটভূমি।

—